

স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য।

MAHARAJA SURJAKANTA.

A SHORT LIFE OF

MAHARAJA SURJAKANTA ACHARJEE BAHADUR

OF

MYMENSINGH.

মহারাজা সূর্য্যকান্ত

শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত প্রণীত।

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us,
Footprints on the sands of Time:—"

H. W. Longfellow.

১ম সংস্করণ।

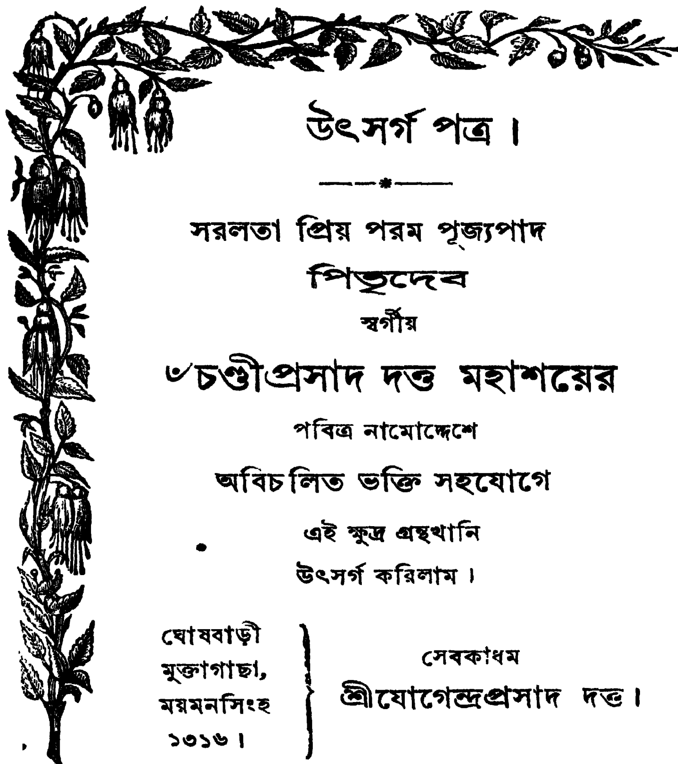
প্রকাশক—সান্যাল এণ্ড কোং

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১৬।

মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১।০ সিকা
কাগজে বাঁধাই ১৲ টাকা

কলিকাতা,
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।



উৎসর্গ পত্র।

সরলতা প্রিয় পরম পূজ্যপাদ

পিতৃদেব

স্বর্গীয়

৺চণ্ডীপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের

পবিত্র নামোদ্দেশে

অবিচলিত ভক্তি সহযোগে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

উৎসর্গ করিলাম।

ঘোষবাড়ী
মুক্তাগাছা,
ময়মনসিংহ
১৩১৬।

সেবকাধম
শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত।

নিবেদন।

মুক্তাগাছা, জন্মস্থান না হইলেও আশৈশব এখানে প্রতিপালিত ; মুক্তাগাছা—কর্ম্মভূমি ; একরূপ জীবনের কেন্দ্রস্থল। কর্ম্মভূমির একটা ইতিবৃত্ত রাখা, নিতান্ত আবশ্যক,—তৎসম্বন্ধে আমিও একটা আকাঙ্ক্ষা বহুদিন যাবৎ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি।

আচার্য্য বংশ সম্ভূত সম্ভ্রান্ত জমিদার মহাশয়গণই মুক্তাগাছার প্রধান অধিবাসী এবং একমাত্র তাঁহাদেরই কার্য্যকলাপ ও চেষ্টা বলে আজ মুক্তাগাছা সর্ব্বজন পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সম্ভ্রান্ত বংশের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণরূপে অন্ধতমসাচ্ছন্নাবস্থায় বিস্মৃতির গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত রহিয়াছে,—অনেকেই তাহার বিশেষ কোন অনুসন্ধান রাখেন না। এ সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া জন সাধারণের গোচরীভূত করার জন্য বহুদিন হইতে আমার কামনা রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত তেমন সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সম্প্রতি আচার্য্য-কুলতিলক স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্তের অলৌকিক জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই চির-পোষিত বাসনার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের ন্যায়-পরায়ণতাই যথার্থ মীমাংসা করিবে।

জীবনী লিখিবার উদ্দেশ্য কি ? তৎপাঠেরই বা আবশ্যকতা কি ? প্রতিভা-সম্পন্ন মানুষ মাত্রেরই জীবনী থাকা প্রয়োজন এবং তৎপাঠে

লোক সমাজের বিস্তর উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। কিরূপে মানুষ প্রতিভা-সম্পন্ন হইতে পারে,—কোন উপায় অবলম্বন করিলে লোক সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হওয়া যায়,—কার্য্যবলে মানুষ কিরূপে ক্ষুদ্র হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে,—দুরবস্থার চরম সীমা হইতে কিরূপে ধীরে ধীরে উন্নতির শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া বসে, ব্যক্তি বিশেষের জীবনী তাহারই এক একটী দৃষ্টান্ত স্থল। এই দৃষ্টান্তের অনুকরণে মানুষ সহজেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে এবং স্বীয় জীবনের দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক নিজেই শোধন করিয়া লইতে পারে। মহামান্য কবিবর কহিয়াছেন ঃ—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And,, departing, leave behind us
Footprints on the Sands of Time :—"

সুতরাং দেখিতে গেলে, প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির জীবন-রহস্যই আমাদের উন্নত-জীবন-গঠনের একমাত্র আদর্শ স্থল।

আমাদের কর্ম্মবীর মহারাজা সূর্য্যকান্ত, নিজের মনোগত ভাব বহুলাংশে তৎপ্রণীত "শিকার কাহিনী" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একরূপ ধরিতে গেলে, তিনি নিজেই উহাতে তাঁহার জীবন রহস্যের ছায়া স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন। এ গ্রন্থখানি তাহারই অনুশীলন মাত্র ; সুতরাং ইহাতে আমার কিছুই কৃতিত্ব নাই, যদি থাকে, তবে তাহা তাঁহার নিজের।

এই গ্রন্থে, জীবন বৃত্তান্ত ব্যতীত অনেকগুলি অতিরিক্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। সে বিষয়গুলি না লিখিলেও বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ ছিল না। কিন্তু কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে এবং অবশ্য

জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া, বাহুল্য দোষ সংশ্লিষ্ট হইবে জানিয়াও উহা সন্নিবেশিত করিতে বাধ্য হইলাম।

গ্রন্থখানি সুসম্পন্ন করিতে অনেকগুলি গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য সেই সমস্ত মহানুভব গ্রন্থ-কর্ত্তাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতা সূত্রে আবদ্ধ রহিলাম। গ্রন্থলিখিত ইতিবৃত্ত গুলি সংগ্রহ কার্য্যে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিকান্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় এবং উহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র সান্যাল, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র লোচন দত্ত মহাশয়গণ আমাকে বিস্তর সহায়তা করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় মহাত্মার সাহায্যে কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

মহারাজা বাহাদুরের পেন্‌সন্ প্রাপ্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত বাবু রামনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করতঃ অনেকগুলি বিষয়ের উপদেশ দিয়া বিস্তর অনুগৃহীত করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট প্রভূত কৃতজ্ঞতা সূত্রে আবদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে প্রার্থনা এই, গ্রন্থের লিখিত বিষয়গুলি মধ্যে কোন ভ্রম প্রমাদ বা কোনরূপ দোষ পরিলক্ষিত হইলে, সহৃদয় পাঠকগণ যদি সেই ভ্রম বা দোষ উপহাসচ্ছলে উড়াইয়া না দিয়া সংশোধন জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ করেন, তাহা হইলে, বন্ধুস্থানীয় সেই সহৃদয় পাঠকগণের নিকট অধিক কৃতজ্ঞতা সূত্রে আবদ্ধ থাকিব এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ হিতৈষী বন্ধু বলিয়াই মনে করিব।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত সম্বন্ধে নূতন কোন সংবাদ বা উল্লেখ যোগ্য ঘটনা কেহ গ্রন্থকারকে জানাইলে, তাহা অতি সমাদরে গৃহীত হইবে ও বারান্তরে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবে।

"সূর্পবদ্দোষানুৎসৃজ্য গুণান্ গৃহ্ণন্তি সজ্জনাঃ"—ঋষিপ্রমুখাৎ এই মহা বাক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠান্তে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

পোঃ মুক্তাগাছা
গ্রাম, ঘোষবাড়ী
জেলা, ময়মনসিংহ
১১ই আশ্বিন ১৩১৬ সাল

বশংবদ
গ্রন্থকার-

মহারাজা সূর্য্যকান্ত।

——:০:——

প্রথম সর্গ।

পূর্ণচন্দ্র।

১৮৫১ খৃঃ অব্দ, মাঘ মাস :—শীত ঋতুর পূর্ণ বিকাশ; প্রকৃতি জড়সড়। শীতসহচরী কুজ্ঝটিকার প্রগল্‌ভতায় তপন পর্য্যন্ত লজ্জিত,—বৃক্ষান্তরাল হইতে বঙ্কিম-কটাক্ষে তাহার চলচলায়মান যৌবনের বাহার দেখিয়াই স্তম্ভিত,—তেজঃ বিকাশে শক্তিহীন। শৈত্যস্নিগ্ধ সমীরণ ক্রীড়াচ্ছলে ধীরে ধীরে পত্রাগ্র-দুলিত ক্ষুদ্র শিশির-বিন্দু দোলাইয়া,—ব্রীড়াবনত শিশির-সিক্ত কুসুম-দামের নব-প্রেমোদ্ভাসিত মুচকি হাসির দিকে একটু কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া, জীব-জগতে কম্পনের মাত্রা বাড়াইয়া দিতেছে। সূর্য্য-সমাগম না দেখিয়া কেহ শয্যা ত্যাগ করিতে চাহে না। এক বিষম বিভ্রাট! এমন হাড়-কাপান ভয়ানক শীতের মধ্যে বৃদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র অনায়াসে একখণ্ড নামাবলী দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক নিজ বাটী সংলগ্ন উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছেন। শীতের দারুণ ভ্রূকুটীতে কিছু মাত্র ভীতির সঞ্চার হইতেছে না। শৈত্যপ্রাবল্যে বৃদ্ধ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন,—হস্তস্থিত ফুলের সাজি ইতস্ততঃ দোদুল্যমান, পুষ্পের বৃন্ত ধারণে হস্ত মুহুর্মুহুঃ বিকম্পিত হইতেছে, তথাপি

বৃদ্ধের সেদিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য নাই। তিনি এক প্রাণে ফুল তুলিয়া সাজিতে রাখিতেছেন। ঈশ্বরে যাহার একাগ্রতা আছে, ভগবচ্চরণে যাহার প্রাণ বাঁধা রহিয়াছে, দুরন্ত শীতে তাহার কি করিতে পারে? তাহার অনাবিল হৃদয়-নিহিত ভক্তিপ্রবণ আবেগের নিকট শীতের ক্ষণিক কম্পন অতি তুচ্ছ।

ফরিদপুর জিলায় অন্তঃপাতী মাদারিপুর সবডিভিশনের এলাকাধীন বাজিৎপুর গ্রামে বৃদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্রের বাসস্থান। ইনি মজুমদার বংশ-সম্ভূত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। সাংসারিক অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল না হইলেও একেবারে নিঃস্ব নহেন। ঈশ্বরে ঈশ্বরচন্দ্রের অচলা ভক্তি,—অটল বিশ্বাস।

বাসস্থান

মজুমদার মহাশয় যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি এখনও প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান করতঃ স্বহস্তে পুষ্প চয়ন পূর্ব্বক আপন ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। শীত গ্রীষ্মে উহার ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না। জীবনের অন্যান্য কর্ত্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে এই অর্চ্চনা কার্য্যও একটী প্রধান কর্ত্তব্যরূপে তাহার জীবন সূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের লোক;—ধর্ম্মে একটু বেশ প্রীতি, ঈশ্বরে একটু ভক্তি—অর্চ্চনাদিতে বিশ্বাস, তাহার প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গিয়াছে। সুতরাং মাঘের দারুণ শীতে তাহার সেই পবিত্র বাসনা স্রোতে বাধা দিতে পারিবে কেন? কর্ত্তব্যবিহীন অলসের নিকট শীতের বিকট ভ্রূকুটি ভীতিব্যঞ্জক হইতে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিকের ধর্ম্মজ্যোতির নিকট সম্পূর্ণ শক্তিহীন।

অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ মজুমদার মহাশয়ের হৃদয় যেন অধিক স্ফূর্ত্তিযুক্ত,—যেন কোথা হ'তে কি এক অজ্ঞাত ভাব-হিল্লোলে মর্ম্ম-লুক্কাইত অভিনব প্রীতি-কুসুম অযত্ন-গ্রথিত মানস-উদ্যানে সহসা হিল্লো-লিত হইয়া বৃদ্ধকে অধিকতর ভগবদ্ভক্তি-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিতেছে।

বৃদ্ধ প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে ঘনীভূত কুয়াসার ঘনাচ্ছাদন ভেদ করিয়া কি যেন কাহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ চাহিতেছেন। আজ যেন সমস্তই তাহার নিকট প্রভূত-প্রীতি-প্রদ বলিয়া বোধ হইতেছে। কুসুমিত উপবন যেন তাহার ভক্তি-প্রণত-হৃদয়ে অমরাবতীর দেবতা-নিষেবিত নন্দন-কানন বলিয়া বোধ হইতেছে;—বিকশিত কুসুম-নিচয়ের শিশির-সিক্ত মধুর হাস্যতরঙ্গে যেন অনন্তশক্তি ভগবানের প্রকৃতিগতা প্রতিচ্ছায়া উজ্জলরূপে প্রতিভাসিত হইয়া তাহার পবিত্র প্রাণে প্রভূত প্রীতির উৎস ঢালিয়া দিতেছে! বৃদ্ধকে দেখিয়া আজ যেন সবাই সহাস্য-বদন। কেন? মজুমদার মহাশয় কিছুতেই উহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না। আপন মনে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন।

সহসা সমবেত বামা-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত হুলুধ্বনি! বৃদ্ধ পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন,—সেই আকস্মিক মঙ্গল-সূচক ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলেন, একজন আর একজনকে কহিতেছে,—"ওগো, খোকা হয়েছে গো, খোকা হয়েছে,—কি সুন্দর চেহারা!" বিষয়টী বৃদ্ধের বুঝিতে বাকী রহিল না। মুহূর্ত্তের ক্ষণিক অস্তিত্ব মুহূর্ত্তে মিশিতে না মিশিতেই কি-এক-অভিনব তাড়িতপ্রবাহ অতি ক্ষিপ্রতা-সহকারে তাহার হৃদয়ের প্রতি ধমনীতে,—প্রতি শোণিত-বিন্দুতে ছুটিয়া গেল;—কি এক মোহময়ী-বিহ্বলতা আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ এইরূপে ক্ষণকাল বিহ্বল-চিত্তে সুখের একটানা স্রোতে ভাসিয়া আকাশসংলগ্ন কল্পনা-প্রসূত অলক্ষিত ভগবন্মূর্ত্তি অবলোকনে ভক্তি-গদ্‌গদ-প্রাণে স্বগত ভাবে কহিলেন,—"প্রভো, তোমারই ইচ্ছা!"

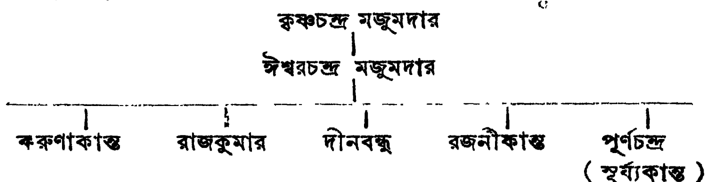
মজুমদার মহাশয় পুষ্পচয়নান্তে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভক্তি সহযোগে আপন ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিলেন এবং নবজাত শিশুর মঙ্গলোদ্দেশে বহু স্তব স্তুতি করিয়া পুত্রের মুখাবলোকন জন্য অন্দরে প্রবেশ

করিলেন। নব-বিকশিত অপত্যের সুবিমল মুখারবিন্দ নিরীক্ষণে বৃদ্ধের নীরস প্রাণও সরস হইয়া উঠিল,—কি এক অভূত-পূর্ব্ব আনন্দ-সলিলে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহামায়ার মায়া,—সে মায়া অতিক্রম করা কার সাধ্য ? স্নেহাপ্লুত-হৃদয়ে আনন্দ-বিহ্বল হইয়া কহিলেন,—"আজ যে মাঘী পূর্ণিমা ! অতি পবিত্র সংযোগ"।

নাম করণ পূর্ণচন্দ্র।

একদিন দু'দিন করিয়া ক্রমে বহুদিন অতিবাহিত হইল। নবজাত শিশুর অন্নাশনাদি বিধিসিদ্ধ ক্রিয়াকলাপ সমাপনান্তে পূর্ণিমা তিথিতে জন্ম বলিয়া বৃদ্ধ সাদরে পুত্রের নাম রাখিলেন,—"পূর্ণচন্দ্র"। কালের আবর্ত্তনে এই পূর্ণচন্দ্রই একদিন সূর্য্যকান্তরূপে বঙ্গের রাজনৈতিক গগনে সমুদিত হইয়াছিল।

ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদে মজুমদার মহাশয়ের পাঁচ পুত্র। করুণাকান্ত, রাজকুমার, দীনবন্ধু, রজনীকান্ত ও পূর্ণচন্দ্র। কালের কঠোর শাসনে ক্রমে সকলেই নিজ নিজ কার্য্য সমাপনান্তে এ মর-জগৎ হইতে চির বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন ; কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ করুণাকান্ত এখনও বার্দ্ধক্যের উচ্চ সোপানে আরূঢ় থাকিয়া কনিষ্ঠ সহোদরগণের স্মৃতিমালো দিন গণনা করিতেছেন।



বৃদ্ধবয়সে সন্তানের স্নেহময় মুখাবলোকন যে কতদূর সুখকর, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে সম্যক্ উপলব্ধি করা শশ-বিষাণ সদৃশ। যাহা হউক, বৃদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র আপনার প্রভাহীন হৃদয়াকাশে পূর্ণচন্দ্রের স্নেহ-

সিঞ্চিত কর-জালের পূর্ণ বিকাশানুভব করিয়া বিস্তর উল্লাসিত হইলেন। যে কেহ উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ তখনই তাহাকে প্রভূত আনন্দ সহকারে পূর্ণিমার চাঁদ পূর্ণচন্দ্রকে আনিয়া দেখান। সে সুখ—সে আনন্দ অনির্ব্বচনীয়!

জন্ম সময়।

২৪ শে মাঘ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা তিথিতে—মকর লগ্নে—পুষ্যা-নক্ষত্রাশ্রিত কর্কট রাশিতে দেবগণে—চন্দ্রের দশায় প্রাতেমাত্র ৪০ পল বেলার সময় ভাগ্যবান পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। এমন মাহেন্দ্রক্ষণে জন্ম বলিয়াই পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ তেজঃ প্রতিভাত হইতে পারিয়াছিল।

ভবিষ্যদ্বাণী।

জন্মের কিছুদিন পরে জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"শিশু অতি ভাগ্যবান্—ক্ষণ-জন্মা; রাজ্যভোগ-সমন্বিত মহা যশোরাশি ইহার ভাগ্য-পটে চিত্রিত। এমন মণি-কাঞ্চনের সংযোগ প্রায়ই দেখা যায় না।" উত্তরকালে জ্যোতির্ব্বিদের কথা যে, অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? *

শৈশবাবস্থা।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পূর্ণচন্দ্রকে ভাগ্যবান বলিয়া প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু শৈশবে তাহার ভাগ্য সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ পাইল না। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই কি এক গুপ্ত ব্যাধি গুপ্ত ভাবে লুক্কায়িত হইয়া যেন সুধার লালসায় রাহুরূপে পূর্ণচন্দ্রে প্রবেশ করিল। তাহাতে পূর্ণচন্দ্র দিন দিন এক কলা দুই কলা করিয়া হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বদাই নাকে মুখে কফের স্রোত প্রবাহিত;—"ফোঁৎ ফোঁৎ করিতেছে কফভরা নাক"—দেখিয়া কেহই বড় একটা নিকটে ঘেঁশিতে দিত না।

---

* বাজিৎপুরনিবাসী মজুমদার বংশীয় কোন প্রাচীন মহাত্মার নিকট হইতে শ্রুত।

সমবয়স্ক বালকদের সহিত খেলা করিতে গেলে তাহারা প্রায়ই পূর্ণচন্দ্রকে ঘৃণা বা উপহাস বাক্যে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিত,—কাহারও সঙ্গে বড় একটা মিশিতে পারিত না। দুর্ব্বলকে কেহ ভালবাসে না। পূর্ণচন্দ্র দুর্ব্বল, রুগ্ন,—বুদ্ধিবৃত্তিও তেমন প্রখর নহে; কাজেই বালকগণ তাহাকে বহু উপায়ে নির্য্যাতন করিত। জননী রত্নগর্ভা ত্রিপুরা সুন্দরীর অঞ্চল ধরিয়া ক্রন্দন ব্যতীত তাহার আর উপায়ান্তর ছিল না।

খেলার সময়।

পূর্ণচন্দ্র শৈশবে রুগ্ন ছিল বটে, কিন্তু একগুঁয়েমি-ভাবটুকু পূর্ণ মাত্রাতেই বিদ্যমান ছিল। যে একগুয়েমিভাব মহারাজা সূর্য্যকান্তের চরিত্রে হাড়ে মাসে জড়িত থাকিয়া তাহাকে কর্ত্তব্য পথে সুদৃঢ় করিয়াছিল,—যাহার বলে তিনি সময় সময় অনেক দুঃসাধ্য সাধনেও সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে শৈশবেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে সামান্য একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই তাহার শৈশব-চিত্র পূর্ণ বিকাশ পাইবে।

গ্রামে যে সমস্ত খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধিয়া রস সংগ্রহ করা হয়, সেই সমস্ত গাছের তলদেশে বালকগণ সমবেত হইয়া হাঁড়ি হইতে রস পান করতঃ বিস্তর আমোদ করিয়া থাকে। আমাদের পূর্ণচন্দ্রও সেই দলের একজন। তবে সে দুর্ব্বল এবং শিশু বলিয়া রসপান তাহার ভাগ্যে অতি অল্পই ঘটিত। যাহা হউক রসের মধুর আস্বাদন পাওয়া অবধি পূর্ণচন্দ্র প্রায় সর্ব্বদাই খেজুরতলায় অবস্থান করিত। একদিন তাহাকে তল্লাস করিতে করিতে গ্রামের লোক হয়রান্ হইয়া কোথাও খুজিয়া না পাওয়ায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। গ্রামের প্রতিঘরে অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না। পরিশেষে বাটীর পশ্চাতে একটী খেজুর গাছের তলায় যাইয়া দেখা গেল, পূর্ণচন্দ্র পিপাসিত চাতকের ন্যায় গাছের অগ্রভাগে বাঁধা হাঁড়ির দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া তথায় দণ্ডায়-

মান আছে। অনুসন্ধানকারীরা তাহাকে লইয়া যাওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করিল,—কত সুমিষ্ট দ্রব্যের প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু তাহাকে খেজুরের রস না দিলে সে কিছুতেই যাইবে না বলিয়া জেদ করিল। ফলতঃ রস না খাইয়া সে এক দিনও প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। এইরূপে অনেক বিষয়ে তাহার এক-গুয়েমি ছিল।

"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র।" এই দুর্ব্বল ম্রিয়মাণ শিশুর ভাগ্য-পটে যে অলক্ষিতে কি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সমুজ্জ্বল যশোবিলেপিত আলেখ্য নিচয়ের সমাবেশ রহিয়াছে,—একদিন এই ক্ষীণচন্দ্রই যে, ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া নিজ প্রতিভার তেজঃ বিকিরণে সংসার আলোকিত করিবে,—শীতের এই মৃদুমন্দ পবনই যে কালে প্রবল প্রতাপান্বিত প্রভঞ্জনরূপে সংসারে অবতীর্ণ হইয়া দুর্জ্জনরূপ মহীরুহ অনায়াসে উৎপাটিত করিবে; তাহা কে জানে? নিয়তির সে রহস্যো-দ্ঘাটন করা কার্ সাধ্য? পূর্ব্বজন্মে কাহার কিরূপ সুকৃতি সঞ্চিত আছে, এ জন্মে কিরূপ ফল প্রসূত হইবে, একমাত্র ভগবান ব্যতীত তাহা কে বলিতে পারে?

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রাচীন কথা।

পূর্ব্ববর্ণিত পূর্ণচন্দ্র কিরূপে মুক্তাগাছার মুক্তারূপে আচার্য্য বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, কালক্রমে সূর্য্যকান্তরূপে কিরূপেই বা বঙ্গের রাজনৈতিক গগন আলোকিত করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বর্ণনার পূর্ব্বে আচার্য্য বংশের পরিচয়,—রাজ্যলাভ প্রভৃতি প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্যক পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য বোধে নিম্নে তদ্বিষয় দুই চারিটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকগণ মধ্যে কাহারও প্রাচীনতত্ত্ব আলোচনায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে, অনায়াসে উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন। মুক্তাগাছার সম্ভ্রান্ত আচার্য্য বংশ অতি প্রাচীন; উহার আদিম অবস্থা একরূপ অন্ধতমসাচ্ছন্ন গহ্বর মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। অনেকেই তদ্বিষয় অনভিজ্ঞ। তাই সেই লুপ্ত রত্নের উদ্ধার মানসে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইল।

কান্যকুব্জাগত কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলতিলক সুষেণ, মুক্তাগাছার আচার্য্য বংশের আদিপুরুষ। বঙ্গাধিপ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন মানসে ১০৩২ খৃঃ অব্দে কান্যকুব্জ হইতে দক্ষ, ভট্ট নারায়ণ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ এবং ছাঁন্দড়, এই পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কার্য্যান্তে তাহাদিগকে কান্যকুব্জে ফিরিয়া যাইতে না দিয়া স্বীয় রাজ্যে বেদাধ্যয়নাদি ধর্ম্মকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন জন্য প্রত্যেককে এক একখানি গ্রাম দিয়া এতদ্দেশে স্থাপন করেন। ক্রমে তাহাদের সন্তান সন্ততি হইলে, তাহারাও পৃথক পৃথক ভাবে এক একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হন এবং এইরূপে বঙ্গে তাহাদের

দক্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ।

বংশ বিস্তার হইতে থাকে। ইহাদের বাসস্থানের নামানুসারেই ব্রাহ্মণের "গাঁই" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সুষেণ সম্বন্ধে দুইটী মত প্রবর্ত্তিত। কেহ কেহ কান্যকুব্জাগত দক্ষাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; আবার কেহ কেহ বলেন যে, সুষেণ, নারায়ণ ভট্ট, পরাশর, ধরাধর, ও গৌতম—এই পাঁচজন ব্রাহ্মণও দক্ষাদি ব্রাহ্মণগণের প্রতিবাসী বৃদ্ধি দ্বারা বাসের সুবিধার জন্য আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ * হইতে দ্বিতীয় বার আনীত হইয়া বিভিন্ন গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিলেন।

সুষেণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ।

এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। হুগলি নদী ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান রাঢ় দেশ নামে খ্যাত; এই দেশে যাহারা বাস করে, তাহারা রাঢ়ী বলিয়া পরিচিত। "বরেন্দ্র দেশ গৌড়ের একাংশ। মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব এবং করতোয়া নদীর পশ্চিমস্থ ভূমিখণ্ড বরেন্দ্র নামে অভিহিত। আদিশূরবংশীয় প্রদ্যুম্নশূর এবং বরেন্দ্রশূর এক সময়ে রাজা হইয়া গৌড় দেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বরেন্দ্র শূরের অধিকৃত খণ্ডের নাম বরেন্দ্র দেশ। অদ্যাপিও ঐ দেশ 'বরেন্দী' শব্দে অভিহিত আছে।"† সুষে-

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র।

* নারায়ণাখ্যো যস্তেষাং শাণ্ডিল্যগোত্র এব সঃ।
রাজাজ্ঞয়া সমায়াতঃ গ্রামতো জম্বুচট্টরাৎ ॥
ধরাধরো বাৎস্যগোত্র স্তাড়িত গ্রামতঃ স্বয়ং।
সুষেণঃ কাশ্যপো জ্ঞেয়ঃ কোলাঞ্চাৎ স্বগ্রয়াগতে
গৌতমাখ্যো ভরদ্বাজ গোত্র ঔডুম্বরাস্তথা।
পরাশরস্তু সাবর্ণো মত্রগ্রামাৎ সমাগতঃ ॥" বরেন্দ্র কুলপঞ্জী।

† শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র মজুমদার কৃত 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ।'

ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতেই বারেন্দ্র শ্রেণী সমুদ্ভূত। মুক্তাগাছার আচার্য্য বংশ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণের ছাপ্পান্ন গাঁই এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর এক শত গাঁই।* "কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে দক্ষের ১৬, ভট্টনারায়ণের ১৬, শ্রীহর্ষের ৪, বেদগর্ভের ১২, এবং ছাঁন্দড়ের ৮ সন্তান জন্মে। অতএব রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা বলেন,—'পঞ্চ গোত্র, ছাপ্পান্ন গাঁই, তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।' বরেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণের একশত গাই এবং ইঁহাদের আদি পুরুষ সুষেণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ। ইহারাও কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান।"†

গাঁই।

সুষেণ হইতে সপ্তম পুরুষ জিগণি মহামুনি পর্য্যন্ত রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই একত্রে একই সমাজভুক্তাবস্থায় বসতি করিয়াছিলেন। তখনও কোনরূপ বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই। কিন্তু আর অধিক দিন একত্রে থাকা ভগবানের ইচ্ছা নহে। জিগণি মহামুনির পুত্র স্বর্ণরেখ ও ভবদেব মধ্যে অকস্মাৎ ভীষণ বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রীতির সুকোমল কুসুমাচ্ছাদনে হিংসারূপ ভীমদর্শন ধ্বংশরূপী কীট প্রবিষ্ট হইয়া সেই সুস্নিগ্ধ কোমলাচ্ছাদন ছিন্ন ভিন্ন করতঃ প্রতিহিংসার জলন্ত প্রতিমুর্ত্তি দেখাইতে আরম্ভ করিল— ভীষণ বিদ্বেষানলের গভীর ভৈরব নিনাদে ব্রাহ্মণ বংশ সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিল। অচিরাৎ "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই" প্রাচীন প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করার জন্যই যেন "রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ পরস্পর পৃথক হন। তৎকালে যাহারা

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র পৃথক।

* "কাশ্যপেঽষ্টাদশ জ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যো চ চতুর্দ্দশ।
চতুর্ব্বিংশতি বাৎস্যেঽপি ভরদ্বাজে তথাবিধঃ।
সাবর্ণে বিংশতির্জ্ঞেয়াঃ গ্রামা হি গাঞিনামকাঃ॥"—বরেন্দ্র কুলপঞ্জী।

† শ্রীযুক্ত কালীনাথ চৌধুরী কৃত রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পৃথক হইলেন, তাহারা পুনর্ব্বার রাজার নিকট নিজ নিজ বাসের জন্য আরও কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন; সেই গ্রামগুলি বরেন্দ্র ভূমের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইল; সুতরাং উহা রাঢ় দেশের ছাপ্পান্ন গ্রাম নামমালার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।" * এই পৃথকের পর স্বর্ণরেখ তাহার দলবল নিয়া বরেন্দ্র ভূমিতে বাসস্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। ভবদেব পূর্ব্ব আবাস স্থানেই রহিলেন। স্বর্ণরেখ হইতেই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে।

স্বর্ণরেখের পুত্র গিন্ধুওঝার তিন পুত্র;—ক্রতু, মতু (মৈত্রেয়) ও গরুড়।

মুক্তাগাছার জমিদার বংশ ও নাটোরের রাজবংশে পরস্পর সম্বন্ধ

ক্রতু হইতে সপ্তম পুরুষে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উদয়ন আচার্য্য ভাদুরী ও তাহা হইতে মুক্তাগাছার আচার্য্য বংশ এবং অপর ভ্রাতা মতু হইতে নাটোরের রাজবংশের উদ্ভব হয়। উভয় বংশের সম্বন্ধ পৃথক পৃথক বংশ তালিকা দ্বারা পরিশিষ্টে দেখাইয়া দেওয়া যাইবে।

মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত (বর্ত্তমানে বীরভূম জিলার) দেবগ্রামে এই আচার্য্যবংশের আদিম বাসস্থান ছিল।

বঙ্গের খ্যাতনামা ভূপতি বল্লালসেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ও বৈদ্যগণের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। "বরেন্দ্র দেশস্থ একশত ঘর ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষার্থ এবং তাহারা ক্রমে সদাচারী হইবেন উদ্দেশ্যে, বল্লালসেন ইহাদিগের গুণাগুণ বিবেচনায় সম্মানোচিত উপাধি প্রদান করতঃ কুলীন (১) সিদ্ধ (২) ও কষ্ট শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত সম্বন্ধ নির্ণয়।

(১) 'আদৌ মৈত্রস্তথা ভীমোরুদ্র সণ্ডাসিনী তথা।
লাহিড়ী ভাদুরীঃ সাধুর্ভাদড়ঃ পংক্তিপূরকঃ॥"—কুলজ্ঞ গ্রন্থ।

(২) 'করঞ্জো নন্দনাবাসী ভট্টশালি চ লাউড়ী।
চম্পটী ঝম্পটী চৈব আতীর্থঃ কামদেবকঃ॥"—কুলজ্ঞ গ্রন্থ।

করিয়াছিলেন। নবগুণ * বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কুলীন। ইহা অপেক্ষা একগুণ ন্যূন বিশিষ্টকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় অভিধা প্রদান করিলেন।"† মুক্তাগাছার আচার্য্য বংশের আদিপুরুষ "ক্রতু ভাদুরী, বল্লাল সেনের সময়ে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।" ‡ মুক্তাগাছার বর্ত্তমান আচার্য্য বংশ সিদ্ধশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তখনকার গুণ-নির্ব্বাচিত কৌলিন্য প্রথা এখন বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বল্লাল সেই এক মাহেন্দ্র সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া বংশমর্য্যাদা স্থাপন পূর্ব্বক কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তনে সমাজ সুদৃঢ় লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করতঃ বিস্তর সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু যদি এই সময়, দেশের এই দুরবস্থার সময়, সেই বল্লাল সেন একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতেন যে, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত মহা সম্মানসূচক কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত থাকিয়া সমাজে কি ভীষণ অনর্থ ঘটিতেছে,—যদি একবার দেখিয়া যাইতেন যে, আজ বঙ্গীয় সমাজে পাপের কি ভয়ঙ্কর নরকাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে—যদি বুঝিতেন যে, নিরপরাধিনী কুলীন কন্যাগণ কি নিদারুণ মর্ম্মযাতনায় উৎপীড়িতা হইয়া সমাজের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক অনায়াসে সেই প্রজ্বলিত পাপ-বহ্নিমুখে আত্মাহুতি দিতেছে, তাহা হইলে বোধ হয়, উহার প্রবর্ত্তন করিতেন কিনা সন্দেহ! সে কাল নাই,—সে দেশ নাই,—সে পাত্র নাই,—তখনকার সে কিছুই নাই,—

বংশমর্য্যাদা।

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

† কুলশাস্ত্র দীপিকা।

‡ ভাদুরী বংশাবলী।

আছে কেবল প্রথা! সুতরাং ঠিক পন্থানুসৃত হইবে কেন? উপযুক্ত সংস্কারাভাবে সমাজ নিতান্ত আবিলতাপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বল্লালের নির্ব্বাচিত নব-গুণালঙ্কৃত কুলীন সম্প্রদায় এখন তৎপরিবর্ত্তে অনাচারাদি নব-দোষাশ্রিত হইয়া এক অভিনব ব্যবসায় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কাজেই কুলীনকন্যাগণের মর্ম্মযাতনা-সমুদ্ভূত অশ্রুধারার নিবৃত্তি হইবে কেন? কৌলিন্যের সেই নাগ-পাশ ছিন্ন করিতে না পারিয়া নরকের পট পরিবর্ত্তনে আজ সমাজে এত অভিনব সম্প্রদায়েরই বা ছড়াছড়ি না হইবে কেন? বর্ত্তমানের দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় উহার সম্যক্ সংস্কার না হইলে সমাজের মঙ্গলাশা আকাশ কুসুম হইতেও অসম্ভব। হায়, তেমন সুদিন কি আর আসিবে?

উদয়ন আচার্য্য ভাদুরী।

বারেন্দ্র-কুল-গৌরব উদয়ন আচার্য্য ভাদুরী একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক ছিলেন। ইনি দর্শনশাস্ত্র-বিৎ পণ্ডিত-প্রবর কুল্লুকভট্টের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ণ যৌবন। দেশের অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ ধর্ম্মে মাতোয়ারা! হাটে, ঘাটে, মাঠে, যেখানে যাওয়া যায়, সেই খানেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী,—সেই স্থানেই বৌদ্ধ-যাজকগণের উচ্চ কণ্ঠস্বর;—বন্যার সলিল-সমাগমের ন্যায় তাহাদের বক্তৃতা-স্রোত দেশ প্লাবিত করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু, পণ্ডিত উদয়ন আচার্য্যের নিকট সে "ভড়ং ভাড়ং" খাটিল না। বৌদ্ধাচার্য্যগণ তাহাদের সামান্য বক্তৃতা-সলিল নিয়া উদয়ন-আচার্য্যরূপী জহ্নু মুনির নিকট অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। উদয়ন আচার্য্য তাহাদিগকে বিচারে পরাভূত করিয়া লোকসমাজে যথেষ্ট প্রশংসার্হ হইলেন।

কুলশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া "যখন উদয়ন আচার্য্য ভাদুরী পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন, সেইকালে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণকে

কৌলীন্য মর্য্যাদা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া * পশুপতিকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন।" † উদয়ন আচার্য্যের সংগৃহীত "কুসুমাঞ্জলি" দর্শনশাস্ত্রের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

আট পটী।

"কুলশাস্ত্র-বিশারদ উদয়ন আচার্য্য ভাতুরী এই নিয়ম করেন যে কুলীনকন্যা শ্রোত্রিয়ে প্রদান করিতে হইবে এবং কুলীনদিগের বিবাহ কুশ-বারি-সংযুক্ত প্রতিজ্ঞা না করিয়া কেবল বাগ্‌দানে সম্পন্ন হইবে না। অধিকন্তু বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণের দোষ গুণ বিচার করিয়া তাহাদিগকে আট পটীতে বিভক্ত করেন যথা :—নিরাবিল, ভূষণা, রোহিলা, ভবানীপুর, বেণী, আলেখানি, কুতুবখানি ও জোনানী।" ‡

চৌগ্রাম ও তাহিরপুর রাজবংশের উৎপত্তি।

উদয়ন আচার্য্য ভাতুরীর দুই পত্নী। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ছয় পুত্র; ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডীপতি, গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি, ও শচীপতি। আচার্য্য কুল-তিলক আমাদের মহারাজা সূর্য্যকান্ত, ভবানীপতির বংশ-

* প্রবাদ আছে,—উদয়ন আচার্য্যের প্রথমা স্ত্রী দৈনিক পূজা শেষে একদিন একটা চাঁপাফুল নির্ম্মাল্য স্বরূপ মাথায় ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও উদয়ন আচার্য্য তাহা মন্দ চোখে দেখিলেন। এমন কি এই সামান্য অপরাধে তাহাকে বিলাসিনী বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, মাতার সহিত পুত্রগণও কুলভ্রষ্ট হইলেন। হায়, সেই কঠোরতা এখন কোথায়? দিবানিশি বিলাসিতা-কূপে ডুবিয়া দুরপনেয় পাপ-কর্দ্দম মর্দ্দন করিলেও এখন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। অনাচারের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইলেও কুলভ্রষ্টা দূরে থাকুক আচারভ্রষ্টা পর্যন্ত বলা যায় না! সেই একদিন, আর এই একদিন!! উদয়ন আচার্য্যের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণই কোন কোন মতে কুলভ্রষ্ট বলিয়া "কাপ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

† গৌড়ের ব্রাহ্মণ।

‡ রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ধর। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে পশুপতিই একমাত্র সন্তান। এই পশুপতির বংশধর রসিক রায় চৌগ্রাম রাজবংশের এবং বিনোদ রাম রায় বর্ত্তমান তাহিরপুর রাজবংশের আদি-পুরুষ।

উদয়ন আচার্য্য ভাদুরীর বাসস্থান সম্বন্ধে দুইটী মত। কেহ বলেন, বগুড়া জিলার অন্তঃপাতী নিসিন্ধ্যা গ্রামে, আবার কেহ বলেন বালিয়াটী গ্রামে বাসস্থান ছিল।

ভবানীপতি হইতে নবম পুরুষে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য।

ইনি দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং শিক্ষার বিস্তর উৎকর্ষ সাধনে তৎকালে বিশেষ প্রতিভা-সম্পন্ন বলিয়া লোক-সমাজে প্রভূত-প্রীতি-সহকারে সমাদৃত হইয়াছিলেন। এই সময় বগুড়া জিলার অন্তর্গত ঢাকোস্তা নিবাসী নিয়োগী-বংশ-সম্ভূত

ঢাকোস্তা।

জনৈক জমিদারের শুভদৃষ্টিতে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য উক্ত গ্রামে কতকস্থান ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। ঢাকোস্তা বগুড়া হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

তৎকালে শেলবর্ষ পরগণা, বগুড়া জিলার অন্তর্গত জনৈক মুসলমান

পরগণে শেলবর্ষ।

ভূম্যধিকারীর শাসনাধীনে ছিল। এই পরগণার অন্যতম অংশীদার জনৈক বিধবা নিজ জ্ঞাতি সরিকগণের হিংসানলে ব্যতিব্যস্ত ও নিরুপায় হইয়া নিজাংশের মহাল তরফ ঝকর, ঝাকর-নিবাসী কুমার সিংহ নামক জনৈক প্রবল ক্ষত্রিয়ের নিকট কিছুদিনের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মহালটী কুমার সিংহের ন্যায় প্রবল ব্যক্তির হস্তগত হইল দেখিয়া মুসলমান ভূম্যধিকারী নিজ স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে বিস্তর অন্তরায় জ্ঞানে দন্ত দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিয়াই নির্ব্বাক হইলেন। রমণীও যে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত না হইলেন, তাহা নহে। পরার্থ-শোষণকারী স্বার্থ-লোলুপ কুমার সিংহের পক্ষে এরূপ

সম্পত্তির লোভ পরিত্যাগ করা সহজ হইল না। কিছুদিন ইজারাসূত্রে ভোগ দখল করিয়া সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার উদ্যোগে বিশ্বাসঘাতকতারূপ পাপের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিতেও ঘৃণা বোধ করিল না। হায়, সংসারে দুর্ব্বলকে বঞ্চনা করিতে সকলেই প্রস্তুত! একটু ক্ষমতাপন্ন হইলেই দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার!! সবলের হস্তে নিপীড়িত হওয়ার জন্যই কি দুর্ব্বলের সৃষ্টি?

কুমারসিংহ।

যাহা হউক, মুসলমান-রমণী, কুমার সিংহের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। রক্ষকই যখন ভক্ষকরূপে পরিণত হইয়াছে, তখন আর কার নিকটে যাইবেন? একমাত্র দুর্ব্বলের বল ভগবান রূপী রাজা;—তিনিও বহুদুর—সুদুর মুরসিদাবাদে। সেখানেই বা কে তাহার পক্ষ সমর্থন করে?

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের প্রতিভা, অংশুমালীর অংশুকণার ন্যায় দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রতিভাসিত হইতেছিল। সে প্রতিভার উজ্জ্বল কর-কণা নিঃসহায়া রমণীর চিন্তাকুলিত হৃদয়ে, ভয়-ত্রাসিত বিকল তন্ত্রীগুলির উৎকর্ষতা সাধন পূর্ব্বক আশার সরস ছবি চিত্রিত করিয়া দিল। রমণী অনন্যোপায় হইয়া কৃতবিদ্য শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের শরণাপন্না হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য, রমণীপ্রমুখাৎ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া অনুকম্পাভিশয্যে তাহাকে আশ্রয় দিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক কুমার সিংহের সমস্ত ষড়যন্ত্র নষ্ট করতঃ তাহাকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদান মানসে রমণীর পক্ষ সমর্থনে মুরসিদাবাদ যাত্রা করিলেন।

মুরসিদাবাদ যাত্রা।

এই সময় ১৭০৪ খৃঃ অব্দে নবাব মুরসিদ কুলি খাঁ, মুরসিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিংসা-কণ্টক-বিবর্জ্জিত অনাবিল হৃদয়-কন্দরে সৎশিক্ষা-সঞ্জাত জ্ঞান-কুসুম মুকুলিত হইলে সে যশোসুবাস গোপনে লুক্কায়িত রাখা অতীব

মুরসিদ কুলি খাঁ।

দুঃসাধ্য,—সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল সদৃশ কার্য্যপ্রবাহেই তাহা দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। স্বদেশ, বিদেশ,—সর্ব্বত্রই বিদ্যার আদর। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" মানুষ যেখানে আছে, সেইখানেই বিদ্যার গৌরব আছে।

নবাব দরবার।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মুরসিদাবাদ নবাব দরবারে যাইয়া প্রতিভা-বলে তথায় বিশেষ যত্ন সহকারে সমাদৃত হইলেন। তাঁহার-কার্য্য তৎপরতা,—তাঁহার বুদ্ধিপ্রাখর্য্য,—তাঁহার অসীম জ্ঞান, একদিন নবাব মুরসিদ কুলি খাঁর হৃদয়েও সন্তোষ উৎপাদন। করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং বিশ্বাসঘাতক কুমার সিংহের ভাগ্যচক্র ঘুরাইয়া দিতে তাঁহার ন্যায় কৃতিমানের আয়াস পাইতে হইল না।

নবাব মুরসিদ কুলি খাঁর সময়েই বঙ্গদেশে জমিদারী পদের সৃষ্টি হয়। এই সময় কয়েক জন লোক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতাপন্ন হইয়া উঠে।

গঙ্গারাম রায়।

মুরসিদ কুলি খাঁর সময়ে তারাসের জমিদার বংশের আদিপুরুষ গঙ্গারাম রায় প্রধান কাননগুঁর পদে এবং নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবনের জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় রঘুনন্দন নবাবের দক্ষিণ হস্তরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তন্মধ্যে রায় রঘুনন্দনের প্রতিপত্তিই একটু বেশী ছিল। "নবাব,

রায় রঘুনন্দন।

রঘুনন্দনকে প্রধানামাত্য পদে নিযুক্ত এবং 'রায়-রাঁয়া' উপাধি ও খেলাত প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন রায় নবাবের দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অসীম ক্ষমতা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন নবাব-প্রতিনিধিত্বে যাহা করিতেন তাহাতে নবাব দৃক্‌পাতও করিতেন না।"* তাঁহার

* কুলশাস্ত্রদীপিকা।

প্রযত্নেই কনিষ্ঠের ভাগ্যে নাটোরের ন্যায় বিস্তীর্ণ ভূভাগের কর্ত্তৃত্ব লাভ ঘটিয়াছিল। মহাত্মা রায় রঘুনন্দন দ্বারা কৃতবিদ্য শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যও বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য বিশেষ চেষ্টায় মুসলমান রমণীর কার্য্যোদ্ধার করিয়া দরবার হইতে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরণের আদেশ বাহির করিলেন। ফৌজ লইয়া তিনি স্বয়ং ঝাকরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন, এমন সময় সেই দুর্ভাগা রমণীর মৃত্যু সংবাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। কিয়ৎকাল বিমর্ষ-চিত্তে চিন্তা করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশার উত্তেজনা বলে চিন্তা-স্রোত অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন। মালিক-শূন্য এই বিপুল সম্পত্তি বিশ্বাস-ঘাতকের ভোগ-বিলাসে পর্য্যবসিত হওয়া অপেক্ষা স্বকীয় স্বার্থে উৎসর্গীকৃত হওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন।

তরফ ঝাকরের সম্পত্তি লাভ।

এই সময় রায় রঘুনন্দন তাহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। একমাত্র তাহারই চেষ্টায় তরফ ঝাকরের সম্পত্তি নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া ফৌজ সহকারে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

এদিকে কুমার সিংহ, শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের আগমন-বার্ত্তা পাইয়াই নিজ পরিবার সহ সন্ত্রাসিত চিত্তে বাটী পরিত্যাগ করতঃ স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন।

ঝাকরে বাটী।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের পক্ষে বিশেষ কিছুই আয়াস পাইতে হইল না। সদলবলে কুমার সিংহের পরিত্যক্ত বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। এই বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে।

তৃতীয় সর্গ।

আলাপ সিংহ।

বর্ত্তমান আলাপ সিংহ পরগণা, সুবিখ্যাত আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে 'আলেপসাহি' নামে অভিহিত হইয়াছে।

আলেপসাহি।

ময়মনসিংহ জিলায় যে কয়েকটী পরগণা আছে, তন্মধ্যে আলাপসিংহ পরগণা বহুবিস্তৃত,—কিন্তু তুলনায় বসতি লোক-সংখ্যা কম হইবে। ১৮৫০ খৃঃ অব্দের সার্ভে নকসায় ৩২৬ ৫৫৬ একর, ২ রোড, ১১ পোল জমি;—৬০১টী গ্রাম, এবং পরিমাণ ফল ৫১০'২৪ বর্গ মাইল লিখিত হইয়াছে।

পরিমাণ ফল।

মোগল কুলতিলক আকবর সাহের রাজত্ব কালে মোগল-মারীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিক দিল্লির অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ডীয়মান করে। তন্মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাঁই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ইনি ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে "মসনদালী" উপাধি পরিগ্রহ করিয়া আলেপ সাহি, মমিন সাহি, হুসেন সাহি, প্রভৃতি বাইশটী পরগণার আধিপত্য গ্রহণে জঙ্গল বাড়ীতে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এই ঈশা খাঁ হইতেই জঙ্গল বাড়ীর প্রসিদ্ধ দেওয়ান-বংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে।

ঈশা খাঁ।

ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী মধ্যেই তাহার বিস্তীর্ণ রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এই সময় আলেপ সাহি ও মমিন সাহি পরগণা দ্বয় টিকরানিবাসী মহম্মদ মেন্দি গ্রহণ করেন। এই মমিন সাহি হইতেই মৈমনসিং তৎপর ময়মন-সিংহ নামের উৎপত্তি এবং আলেপ

মহম্মদ মেন্দি।

সাহিই কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া ‘সিংহ’ রূপ ধারণে আলাপ সিংহ হইয়াছে।

তৎপর ১৭২১ খৃঃ অব্দে নবাব মুরসিদ কুলি খাঁর বন্দোবস্ত সময়ে আলাপ সিংহ পরগণা ঘোড়াঘাট চাকলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় আলাপ সিংহের ছয় আনা অংশের মালিক পুঠীজানা নিবাসী রামচন্দ্র ও ভবানী দেব রায় এবং দশ আনা অংশের মালিক লোকিয়া গ্রাম-নিবাসী বিনোদরাম চন্দ ছিলেন।

রামচন্দ্র রায় ও বিনোদ রাম চন্দ।

নবাব মুরসিদ কুলি খাঁ বঙ্গে জমিদার পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার পদমর্য্যাদা কিছুই রক্ষা করেন নাই। মহালের রাজস্ব বাকী পড়িলে তাহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। একজন মানুষকে প্রাণে মাত্র জীবিত রাখিয়া যতদূর কষ্ট দেওয়া সম্ভবপর তাহাতে ত্রুটি করিতেন না। নবাবের দৌহিত্রী-জামাতা রাজস্ব-সচিব সৈয়দ রেজা খাঁ জমিদার নিগ্রহাভিনয়ের প্রধান নায়ক। নির্য্যাতন কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন জন্য একটী সুগভীর গর্ত্ত খনন করাইয়া তাহাতে পূতিগন্ধময় নানাবিধ আবর্জ্জনা পূর্ণ করিয়া রাখা হইত। কোন জমিদার রাজস্ব আদায়ে অসমর্থ হইলে তাহাকে তলব দিয়া আনিয়া ঐ গর্ত্তে একরূপ অনাহারে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। রাজস্বের টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তির কোনই সম্ভাবনা ছিল না। হায়, কত হতভাগ্য রেজা খাঁর এই পৈশাচিক ব্যবহারে সম্পত্তি,—আত্মীয় স্বজন,—পরিশেষে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন। পিশাচ-হৃদয় রেজা খাঁ হিন্দুগণকে পরিহাস করিবার ছলে এই গর্ত্তের নাম “বৈকুণ্ঠ” রাখিয়াছিলেন।*

বৈকুণ্ঠ বাস।

* বৈকুণ্ঠ বাস সম্বন্ধে মি, জে, সিঃ মার্সম্যান লিখিয়াছেন :—"One Nazir Ahmed is said to have subjected the Zaminders to every kind of

১৭২৫ খৃঃ অব্দে দশ কাহনীয়ার (সেরপুরের) জমিদার সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরী, রেজা খাঁর এই "বৈকুণ্ঠবাস" করিয়া জমিদারী ইস্তাফা করেন।*

কাগমারীর জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া "বৈকুণ্ঠবাস" করতঃ ইনাতুল্যা চৌধুরী নামে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ দ্বারা মুরসিদ কুলি খাঁর মনস্তুষ্টি বিধান পূর্ব্বক নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।†

আলাপসিংহের তদানীন্তন ভূম্যধিকারী পুঠীজানার রায় এবং লোকিয়ার চন্দ মহাশয়দের অদৃষ্টাকাশে দস্যু-রাহুর আবির্ভাবে ইরশালী খাজানার টাকা সহকারে সৌভাগ্য-চন্দ্রমা, রেজাখাঁর বৈকুণ্ঠ-নিহিত ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া হতভাগ্যগণকে বিষম বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। পরিশেষে তাঁহারা বৈকুণ্ঠবাস রূপ অত্যাচারের পূর্ণ গ্রাসে সম্পত্তি ইস্তাফা দিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আলাপসিংহ ইস্তাফা

এই সময় কৃতবিদ্য শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মুরসিদাবাদ নবাব দরবারে উপস্থিত ছিলেন। দরবারে তাঁহার একটু বেশ প্রতিপত্তিও জন্মিয়াছিল। তিনি এই সুযোগ ছাড়িলেন না; আলাপ সিংহের জমিদারী লাভে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন।

torture when their rent fell into errears. But Said Reza Khan, who had married the Nobab's grand daughter, exceeded all others in cruelty. To enforce the collections, he caused a pond to be dug, which was filled with ordure and into-lerable filth. The Zaminders, who with-held their rents, where dragged with a rope through this place, which the inventor called, by way of mockery Baikunt or Paradise." History of Bengal.

* ৺হরচন্দ্র চৌধুরী কৃত "বংশানুচরিত।"

† কায়স্থ বংশাবলী।

১৭২৫ খৃঃ অব্দে নবাবের আদেশ ক্রমে কাননগু গঙ্গারাম রায় তদন্ত জন্য আলাপ সিংহ আগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য, গঙ্গারাম রায়কে কয়েকটী মহাল ছাড়িয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়া তদন্তীয় রিপোর্ট তাহার সাপক্ষে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে গঙ্গারাম রায়ও মহাল অনুর্ব্বর,—খাজনার সংগস্থা হয় না,—প্রজা দরিদ্র ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিলেন।

কাননগুঁর তদন্ত

এই সময়, সহসা নবাব মুরসিদকুলি খাঁর মৃত্যু হইলে পর, সুজা উদ্দিন ও মির্জা মহম্মদালীর মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য নিজ কৃতিত্ব বলে মির্জা মহম্মদালীর পক্ষ সমর্থন পুর্ব্বক এমন কয়েকটী গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন যে, তাহাতে সুজা উদ্দিনের রাজ্য-প্রাপ্তির আশা জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় নিরাশা-সলিলে বিলীন হইয়া মহম্ম-দালীর নির্ম্মল নীলিমা-রঞ্জিত ভাগ্য-গগন প্রদীপ্ত আশা-ছায়া-পথে আলোকিত হইয়া উঠে। মির্জা মহম্মদালী রাজ্য প্রাপ্তির পর আলিবর্দ্দি খাঁ নাম পরিগ্রহ পুর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। সুজা উদ্দিন মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁ

আলিবর্দ্দি খাঁ, বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও উপকারী শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের কথা বিস্মৃত হন নাই। তৎকৃত সদনুষ্ঠানের পুরস্কার স্বরূপ আলাপ সিংহ পরগণার জমিদারী তাহাকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজ মহত্ত্বের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলেন। কৃতবিদ্য শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য ১৭২৭ খৃঃ অব্দে আলাপ সিংহ পরগণার স্বত্ব স্বামিত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

আলাপ সিংহ পরগণার জমিদারী লাভ

সত্যবাদী শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য সম্পত্তি লাভ করতঃ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে গঙ্গারাম রায়ের অভিপ্রায় মত তাহাকে "বৈলর, লক্ষ্মীপুর, কাজি সিমলা, ও কালি বাজাইল"—এই চারিটী মহালের স্বত্ব-স্বামিত্ব ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে তালুক সূত্রে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।* সেই হইতেই আলাপ সিংহ পরগণার এই চারিটী মহাল তারাসের জমিদারের শাসনাধীনে শাসিত হইয়া আসিতেছে। উত্তর কালে ঐ তালুক গবর্ণমেণ্টের খারিজা সূত্রে পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের পরলোক প্রাপ্তি

সুকৃতি-বলে ক্রমে দুইটী বৃহৎ সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া জমিদার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মুরসিদাবাদের দরবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছুদিন শান্তি-সুখ-সম্ভোগ জন্য ঝাকরের বাড়ীতে অবস্থান করেন। ঐ স্থানেই তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার চারিপুত্র;—রামরাম, হরিরাম, বিষ্ণুরাম ও শিবরাম।

পিতৃবিয়োগের পর, কিছুদিন ভ্রাতৃচতুষ্টয় একত্রিত থাকিয়া ঘটনাধীনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম আচার্য্য পৃথক হইয়া নিজাংশের চারিআনা সম্পত্তিও পৃথক করিয়া লইলেন। অবশিষ্ট তিন ভ্রাতার বার আনা অংশ এজমালীতেই থাকে।

এই সময়ে বার আনা তরফ হইতে চাঁপাপুরে একটী কাছারী স্থাপিত হয় এবং তথায়—৺জগন্মাতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রীতিমত অর্চ্চিত হইতে

* প্রবাদ আছে, কাননগু গঙ্গারাম রায় তদন্ত উপলক্ষে আলাপ সিংহ আসিয়া যে যে স্থানে বাসা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ২।৪ দিন বাস করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই তাঁহার অধিকার। বাশাটি ভাবকী প্রভৃতি স্থানে টুকরা ২ দুই চারি খানা মহাল দৃষ্টে ঐ প্রবাদ বাক্যের সত্যতাও প্রতিপন্ন হয়। বাস্তবিক পক্ষে ঐ সমস্ত স্থানে বাসার উপযোগী অতি সামান্য সামান্য স্থান বৈলরের অধীন শাসিত হইতেছে। সম্ভবতঃ এই সব স্থানে তিনি ২।৪ দিন বাস করিয়া গিয়াছেন।

থাকেন। ৬জগন্মাতার বাড়ী যদিও মহারাজা বাহাদুরের নির্দ্দিষ্ট অংশে পড়িয়াছে তথাপি বিগ্রহে বার আনার সমান অধিকার। ক্রমে অংশ পৃথকের সহিত কাছারীও পৃথক পৃথক ভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

রামরাম আচার্য্য

পৃথক হওয়ার পর রামরাম আচার্য্য দেখিলেন, আলাপ সিংহের সম্পত্তিই বহু বিস্তৃত; তথায় যাইয়া বাস করাই সুবিধাজনক। তাই তিনি এই পরগণার মহাল সমূহ পরিদর্শন জন্য আলাপ সিংহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আলাপ সিংহ পরগণা অতি বিস্তৃত স্থান। এখন যেমন লোকের বসতি হইয়া ক্রমে স্থানের অভাব হইতেছে,—একটু স্থানও আবাদের বাকী নাই, পূর্ব্বে তেমন ছিল না। অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাপূর্ণ ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল ছিল। মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি গ্রাম,—অতি বিরল বসতি। রাম-রাম আচার্য্য স্বীয় সম্পত্তিতে পদার্পণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন;—অবিন্যস্ত সুবিশাল অরণ্যানীর শ্যাম-গম্ভীর সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। কোথাও উচ্চচুড় বিটপী-শিরে নিবিড় নীরদ-মালা-লাঞ্ছিত ঘন পত্রাচ্ছাদন ভেদ করিয়া অংশুমালীর অংশু-

আলাপসিংহ পরিদর্শন

কণিকা অচির-প্রভার ন্যায় চমকিত হইতেছে। কোথাও স্বভাবসঞ্জাত-অযত্ন গুম্ফিত লতিকা-নিকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে কুসুম-নিচয় বিকসিত হইয়া সোহাগ-গুঞ্জরিত মধুপ-কুলে মধু-বিতরণে মুক্ত-প্রাণ! কোথাও ভীম-বিভঙ্গিমা ভীষণ রদ-রঞ্জিত শার্দ্দূল-রাজের ভীতি-বিকুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গি-দর্শনে ভয়-বিক্রুত ক্ষুদ্র শশক পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেছে,—আবার দৌড়িতেছে,—আবার চাহিতেছে! মাঝে মাঝে নর-কণ্ঠ-নিনাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম,—তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্যবীথিকা তমসাচ্ছন্ন পথিকের একমাত্র আশ্রয়! গ্রাম ছাড়িয়াই 'বন,—আবার বন,—ভীষণ হইতেও ভীষণ!!

কোথাও শ্যামল-শষ্প-শোভিত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে পুষ্পিত বিটপী-তলে হরিণ শিশু জননীর সহিত বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছে। কোথাও বা সুবিস্তীর্ণ অনাবিল স্বচ্ছ বাপী-জলে সলিলচারী বন-বিহঙ্গের-চরণ-চালিত মৃদু বীচি বিভঙ্গে তপন-তাপ-তৃষিতা পঙ্কজিনী লীলা-ললিত-ভাব-হিল্লোলে হাসিয়া হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে অতীত স্মৃতি-পরিচায়ক প্রাচীন অট্টালিকা,—সুবৃহৎ ইষ্টক-স্তূপ,—বিশাল দীর্ঘিকা, দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া অতি প্রাচীন কালের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে! রাম-রাম আচার্য্য অধিকাংশ স্থানই এবম্বিধ শান্ত-গম্ভীর অরণ্য-সঙ্কুল অবলোকন করিয়া ভয়-ভক্তি বিমিশ্রিত ভাব-লহরীতে কেমন যেন হইয়া গেলেন। তাহার সেই অননুভূত-পূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাব-স্রোত যেন আনন্দ-পরিস্রুত তরঙ্গের উপর তরঙ্গ—তদুপরি তরঙ্গ তুলিয়া প্রীতির উৎস ঢালিতে লাগিল। প্রবাদ-প্রচলিত ভগদত্তের গৃহভগ্নাবশেষ, 'বার তীর্থ' নামক দীর্ঘিকা প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শনে তাঁহার প্রাণ বিস্ময়-রসে পরিপ্লুত হইয়া গেল।

বাহাদুরপুর অবস্থিতি।

এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি পরিশেষে তপ্পে সাত শিক্কার অন্তর্গত বাহাদুরপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলেন। এই সময় অপর তিন ভ্রাতা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন। বাহাদুর-পুরের দেবালয়াদির পরিচয়ে তাঁহাদের বাসভূমির কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে ষোল আনারই মহাল বিদ্যমান এবং উত্তরকালে ক্রমে ষোল আনা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন কাছারী স্থাপিত হইয়াছে। কিছুদিন বাস্তব্যের পর এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আয়মান নদীর তীরস্থ মুক্তা-গাছা নামক স্থান বাসস্থানোপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন। *

* বাহাদুরপুরের বাটী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন কথকতামাত্র।

বর্ত্তমান মুক্তাগাছার পশ্চিমাংশ, উত্তর পার্শ্ব ও পূর্ব্বাংশ দিয়া আয়মান নদী প্রবাহিত। এই নদী মুক্তা-গাছার প্রায় আট মাইল পশ্চিমস্থ 'বড়ই-বিল' হইতে উৎপন্ন হইয়া নানা জনপদ বিধৌত করতঃ ঢাকার দক্ষিণাংশে ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। কালের কঠোর শাসনে বর্ত্তমানে উহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে বটে,—কিন্তু একদিন এই আয়মান নদী প্রবল-বাত্যা-বিক্ষোভিত তরঙ্গ-ভঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে কল্ কল্ নাদে প্রবাহিত হইত! একদিন উহারও যৌবন-সুলভ-গর্ব্ব-স্ফুরিত-স্ফীত-বক্ষে বাণিজ্য-সম্ভার-শোভিত তরণী-নিকর শ্রেণী-বদ্ধভাবে সংবদ্ধ থাকিয়া ব্যবসায়ীর প্রাণে অপরিসীম প্রীতির উৎস ঢালিয়া দিত,—একদিন এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীরও গুরু গম্ভীর কল্ কল্ নিস্বনে দাঁড়ী মাঝির আনন্দোচ্চারিত "বদর বদর" ধ্বনি মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব স্বর-গ্রামের সৃষ্টি করিত! হায়, নিয়তির কর্ম্ম-বশে সে সমস্তই কাল-প্রবাহে মিশিয়া গিয়াছে। সে তরঙ্গ,—সে কল্ কল্ ধ্বনি,—সে খর-স্রোত তখনকার সে কিছুই নাই। স্থানে স্থানে রেখা মাত্র অবশিষ্ট।

আয়মান নদী।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল! এ জগতে আসিয়া কিছুই স্থিরভাবে থাকিতে পারে না। আজ যিনি প্রকৃতি-পুঞ্জ-পরিবেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিপতি, কাল কর্ম্ম ফেরে তাঁহার স্কন্ধে ভিক্ষা-ঝুলি দুলিতে কতক্ষণ? সুতরাং তখনকার সেই তরঙ্গ-বিভঙ্গে যৌবন-দর্পিতা আয়মান নদী আজ যে, শৃগাল কুকুরের পদচিহ্ন সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া ভগবান বিষ্ণু-বক্ষে পবিত্র ভৃগু-পদ-চিহ্ন জ্ঞানে সন্তুষ্টা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পরিবর্ত্তনশীল সংসারের এইরূপ বিসদৃশ ভাবাবলোকনেও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না,—আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না,—চোখের সাম্‌নে অহঙ্কারের অতি জঘন্য অধঃপতন দেখিয়াও প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা অহং-

রাগে রঞ্জিত হইয়া ধ্বংস-মূলক হিংসা-ধ্বনি প্রজ্বলিত করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করিতেছি,—ভগবানের রাজ্যে ইহাই আশ্চার্য্য !!

মুক্তারাম কর্ম্মকার।

যাহা হউক, রাম-রাম আচার্য্য, আয়মান তীরস্থ মুক্তা-গাছা আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। তৎকালে এই স্থানে মাত্র কয়েক ঘর ইতর শ্রেণী লোকের বসতি ছিল। সকলেই একরূপ উচ্ছৃঙ্খল-ভাবাপন্ন অসভ্য। মুক্তারাম নামক জনৈক কর্ম্মকার এই সময় তথায় বাস করিত। মুক্তারাম অসভ্য-সংস্পর্শে বাস করিলেও নীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিল। আগন্তুক রাম-রাম আচার্য্য তাহার মনিব, এ কথা জানিতে পারিয়া দরিদ্র মুক্তারাম, অর্থাভাবে একটী পিতলের গাছা নজর স্বরূপ প্রদান করিয়া মনিব-দর্শন-সুখ উপভোগ করে। রাম-রাম আচার্য্য এ পর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা এইরূপভাবে সম্মানিত হন নাই।

মুক্তাগাছা নাম করণ।

সুতরাং স্বীয় প্রজার প্রীতি-প্রদত্ত নজর স্বরূপ গাছাটী তাঁহার নিকট বড়ই মূল্যবান বলিয়া বোধ হইল। তিনি অতি যত্ন সহকারে এই নজর গ্রহণ পূর্ব্বক সংসারে প্রভুভক্ত প্রজার স্মৃতি জাগরূক রাখার উদ্দেশে মুক্তারামের নামানুকরণে স্থানটীর নাম "মুক্তা-গাছা" বলিয়া তথায় স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। *

ভদ্রাসন ও পরিখা।

এই ভদ্রাসন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া নির্ম্মিত হইল। থানা বাড়ী, বাগান বাটী ও মাল খানা। দেবালয়, থানা বাড়ীরই একাংশরূপে নির্ম্মিত হইল। ইহার চতুর্দ্দিকে সুগভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টন করতঃ বাসভবন সুরক্ষিত করা হইল। এই পরিখার চিহ্ন অদ্যাপিও ৺কালী বাড়ীর পূর্ব্বদিক দিয়া

* প্রাচীন জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত।

বাজার নারায়ণ গঞ্জের পশ্চিম প্রান্তে দেদীপ্যমান আছে। স্থানে ২ ভরট্র হইয়া পণ্যবীথিকায় পরিপূর্ণ হইয়াছে,—স্থানে ২ মিউনিসিপালিটীর রাস্তা হইয়া পরিখার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়াছে।

৺রাজরাজেশ্বরী।

মুক্তাগাছার বাটী নির্ম্মিত হইলে পর, রাম রাম আচার্য্যের প্রযত্নে ৺রাজরাজেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠিতা। হন। ৺রাজরাজেশ্বরী একাল পর্য্যন্ত আচার্য্য বংশের কুলদেবতা স্বরূপ অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। এই বিগ্রহে ষোল আনার অংশই বিদ্যমান।

পৃথক বাস-ভবন, সাবেক চারি আনী।

কালক্রমে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস-ভবন পৃথক করার প্রয়োজন হইয়া উঠে। রাম রাম আচার্য্য পূর্ব্বেই পৃথক হইয়া ছিলেন, এখন সেই অনুসারে সম্পত্তির ।০ চারি আনা অংশ সহ মালখানা বাড়ীতে যাইয়া নিজ বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন। বর্ত্তমান 'ছোট হিস্যা' এই স্থানে অবস্থিত। এই রাম-রাম আচার্য্য সাবেক চারি আনীর আদি পুরুষ।

বিষ্ণুরাম আচার্য্য।

তৎপর তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্ণুরাম পৃথক হইয়া বাগান বাড়ীতে বাটী নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে বিনায়ক বাবুর বাটী * এই স্থানে অবস্থিত। বিষ্ণুরাম হইতে বিনায়ক বাবুর তরফ, পূবের চৌতরফ, ও উত্তরের চৌতরফ সমুদ্ভূত হইয়াছে। সম্পত্তি ।০ চারি আনা অংশ।

বিষ্ণু সাগর।

বিষ্ণুরাম পৃথক হওয়ার পুর্ব্বে তাহার প্রযত্নে বার আনা অংশ হইতে একটি সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনিত হয়। বিষ্ণুরাম আচার্য্যের নামানুসারে উহা 'বিষ্ণু সাগর' নামে

* এই বাড়ী সাধারণতঃ নারায়ণ মহাশয়ের তরফ বা শ্রীধর বাবুর বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। সেই হইতেই উহা 'বিষ্ণু সাগর' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক পুষ্করিণীটি একটি দেখিবার জিনিষ।

হরিরাম।

দ্বিতীয় ভ্রাতা হরিরাম এবং কনিষ্ঠ শিবরাম খানা বাড়ীতে একত্র বাস করেন। তাহাদের সম্পত্তি আট আনা অংশ এজমালীতেই থাকে। এই স্থানে বর্ত্তমানে জগৎকিশোর বাবুর বাড়ী অবস্থিত। উভয় ভ্রাতা একত্রে থাকা-বস্থাতে এই বাড়ীর নাম "আট আনা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। *

উল্লিখিত ভ্রাতৃত্রয়ের পৃথক পৃথক বংশাবলী এবং সম্পত্তির অংশ পরিশিষ্টে বিশেষরূপে দেখাইয়া দেওয়া যাইবে।

শিবরাম।

কনিষ্ঠ শিবরামের বংশে আমাদের দয়ার সাগর মহারাজা সূর্য্যকান্ত সমুদ্ভূত হন। কৃতিত্ব বলে ইনিই আচার্য্য বংশ সমুজ্জ্বল করিয়া অশেষ যশঃপারিজাতে বিভূষিত হইয়াছেন। এই বংশের বাড়ী 'রাজবাটী' বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ।

রঘু নন্দন।

শিবরাম আচার্য্যের মৃত্যুর পর তদীয় একমাত্র পুত্র রঘুনন্দন সম্পত্তির অধিকারী হন। ইনি অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। কাহারও সহিত কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু অপর সরিক নানা উপায়ে তাঁহাকে পৈত্রিক বিষয়ে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন সে সমস্ত ক্ষতি বুঝিতে পারিয়াও অনেকটা সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখিলেন যে, সরিকের এই প্রবঞ্চনা-

সরিকের অত্যাচার।

স্রোতে তিল তিল করিয়া পরিশেষে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিই ভাসিয়া যাইবে, তখন উহার প্রতিকারের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

---

* উত্তরকালে চারি আনা অংশ পৃথক হইয়া গেলেও পরও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই বাড়ী সাধারণতঃ "আটআনী" বলিয়াই খ্যাত।

১৭৬৯ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। চতুর্দ্দিকে 'হা অন্ন, হা অন্ন' ব্যতীত অন্য কোন শব্দ ছিল না। রাশী রাশী লোক অন্নাভাবে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। এই দারুণ দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলিয়া প্রসিদ্ধ। রঘুনন্দন আচার্য্য এই সময় অন্ন বিতরণে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত প্রজাগণকে রক্ষা করার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

রঘুনন্দন আচার্য্য সরিক তরফের নিদারুণ হিংসা-বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া তাহাদের নামে এক মোকদ্দমা স্থাপন করতঃ ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে রীতিমত মহাল বাটোয়ারা দ্বারা নিজের চারি আনা অংশ পৃথক করতঃ বাড়ীও পৃথক ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইলেন। ঝাকরে অবস্থান কালে চারি আনা অংশ পৃথক হইয়া সাবেক চারি আনী নাম পরিগ্রহ করায় এই তরফের নাম 'দরি চারি আনী" হইল।

দরি চারি আনী

রঘুনন্দন রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে বিশেষ উপযুক্ত লোক ছিলেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মালিকানা খাজানা কখনও বাকী পড়ে নাই। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টেরও কোন খেজালত পাইতে হয় নাই। *

* মিঃ ডবলিউ রটন সাহেব জিলার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ১৭৮৮ খৃঃ অব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী যে রিপোর্ট করেন তদনুবাদ করতঃ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তাহার 'ময়মনসিংহের ইতিহাসে' লিখিয়াছেন :—"* * এই অংশের মালিক রঘুনন্দন। অপর ৮৩ আনা হইতে এই অংশ ৩।৪ বৎসর যাবৎ পৃথক করা হইয়াছে। রঘুনন্দন উপযুক্ত লোক; রীতিমত খাজানা চালাইতেছেন। শ্যামকিশোর ও চন্দ্রকিশোর ইহার পৈত্রিক অনেক বিষয় হস্তগত করায় অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইনি তাহাদের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছেন।

এই সময় ১৭৮৭ খৃঃঅব্দে রাজ্য শাসন বিষয়ে সুবিধার জন্য ময়মনসিংহ জিলা স্থাপিত হয়। বেলুহার কালেক্টর মিঃ ডবলিউ, রটন সাহেব উহার কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। তখন কালেক্টরের আফিসাদির কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। অধিকাংশ সময়েই বেগুন বাড়ীর কোম্পানীর কুঠীতে আফিস হইত। তৎপর ১৭৯১ খঃঅব্দে শেহরা গ্রামে বর্ত্তমান নসিরাবাদ সহর স্থাপিত হইয়া তথায় রীতিমত আফিসাদি হইতে থাকে। এই স্থান রঘুনন্দন আচার্য্যের জমিদারী-ভুক্ত।

ময়মন সিংহ জিলা স্থাপন

নসিরাবাদ সহর স্থাপন

বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান সন্ততি হইল না দেখিয়া রঘুনন্দন আচার্য্য 'গৌরীকান্তকে' দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাতেই সুস্নিগ্ধ স্নেহবারি সিঞ্চন করতঃ হৃদয়ের কথঞ্চিৎ জ্বালা নিবারণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। পিতৃবিয়োগের পর গৌরীকান্ত রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘ কাল ভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

গৌরীকান্ত

গৌরীকান্ত আচার্য্যের পরলোক গমনের পর তাঁহার বিধবা পত্নী বিমলা দেব্যা স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রীতি-সিঞ্চিত শাসন গুণে প্রজাগণ প্রতিনিয়ত শান্তি-সলিলে নিমজ্জিত থাকিয়া কায়-মনোবাক্যে মঙ্গল-ময় ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিত। প্রাতঃস্মরণীয়া বিমলা-দেব্যা দয়া ও ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি রূপে এ মর জগতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

বিমলা দেব্যা

পুণ্যশীলা বিমলা দেব্যা ৺কাশীধামে নিজ পতির নামে '৺গৌরীকান্তেশ্বর' শিব স্থাপন পূর্ব্বক বিরাট আয়োজনে অন্নচ্ছত্র দিয়াছিলেন। তাহার অপর্য্যাপ্ত অন্নদানে বিমোহিত হইয়া কাশীবাসী আবাল-বৃদ্ধ-

কাশীতে অন্নছত্র
অন্নপূর্ণা খ্যাতি

বনিতা সমস্বরে তাঁহাকে "রাণী বিমলা দেব্যা অন্নপূর্ণা" বলিয়া ডাকিত। অদ্যাপিও তিনি ঐ নামে খ্যাত। কাশীতে তাঁহার বাড়ী সর্ব্বজনপরিচিত।

দত্তক গ্রহণ

কিয়দ্দিবস রাজ্যশাসনাদি বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া রাণী বিমলা দেব্যা, কাশীকান্ত আচার্য্যকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন। পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে তাহার হস্তে রাজকার্য্য অর্পণ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনাদি ধর্ম্মকার্য্যে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি ভরতপুর রাজ্যের মহামান্যা মহারাণীর সহিত ৺কাশীধামে "সই" সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

ভরতপুরের মহারাণীর সহিত 'সই' সম্বন্ধ স্থাপন

ধর্ম্মপরায়ণা বিমলা দেব্যা, কলিকাতা কালীঘাটের ৺কালী মাতার গলদেশে স্বর্ণবিনির্ম্মিত 'মুণ্ডমালা' দিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি-সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্ম কার্য্য ও দেব প্রতিষ্ঠা

ইনি ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃপাতী বালিপাড়া নামক স্থানে তদঞ্চলের প্রজামণ্ডলীর জলকষ্ট দূরীকরণার্থ নিজ ব্যয়ে একটী দীঘি খনন করিয়া দেন এবং ঐ স্থানে নিজ শ্বশুরের নামে '৺রঘুনন্দনেশ্বর' শিব স্থাপন করিয়া দৈনিক ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেন। অদ্যাপিও রীতিমত ভাবে বালিদিয়া কাছারীর তত্ত্বাবধানে তাঁহার অর্চ্চনা হইয়া আসিতেছে। ১৮২০ খৃঃ অব্দে মুক্তাগাছায় নিজ নামে '৺বিমলেশ্বর' শিব স্থাপন করতঃ স্বর্ণকুম্ভ-শোভিত চিত্ত-বিনোদন সুদৃঢ় মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।*

* ৺ বিমলেশ্বর শিবের মন্দিরে এক খণ্ড প্রস্তর ফলকে লিখা আছে—

"দ্বিধাহমিত্র নাশাকে।
স্থাপিতো বিমলেশ্বরঃ।
নির্ম্মায় বিমলাদেব্যা।
বিমলেশ্বরমন্দিরং॥" শকাব্দা ১৭৪২।

বিমলা দেব্যার বর্ত্তমানেই দত্তক কাশীকান্ত আচার্য্য রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি একজন মহাতেজস্বী এবং ভোগ-বিলাসসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় অন্যে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে, তাঁহার মনে নিতান্তই 'জেদের' সঞ্চার হইত। যাহাতে ঐরূপ কার্য্যে তিনি তদপেক্ষা অধিক ব্যয়বাহুল্য করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন সেইরূপ চেষ্টার বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করিতেন না। প্রত্যেক কার্য্যেই প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিযোগিতার বশবর্ত্তী হইয়া হস্তক্ষেপ করিতেন।

কাশীকান্ত আচার্য্য।

তাঁহার একটী মনোরম্য-রদ-রঞ্জিত হস্তী ছিল। তিনি উহাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। বস্তুতঃ ঐরূপ সর্ব্বজন-প্রশংসিত মনোজ্ঞ হস্তী সচরাচর দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। একদা মুরশিদাবাদের নবাব সাহেব জনশ্রুতি-মূলে হস্তীর সৌন্দর্য্য-খ্যাতি শ্রুত হইয়া কাশীকান্তকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি-জ্ঞাপক সংবাদ প্রেরণে, নজর স্বরূপ মাত্র ঐ হস্তীটী চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সৌখীন কাশীকান্ত রাজা উপাধি অপেক্ষা চিত্ত-রঞ্জক হস্তীটীর মূল্য অধিক মনে করতঃ অম্লানবদনে তেমন সম্মান-সূচক উপাধিদানের প্রস্তাবটী প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই এক দিন, আর এই এক দিন! হায়, সময়ের কি ঘোর পরিবর্ত্তন!!

রাজা উপাধি প্রত্যাখ্যান।

কাশীকান্ত দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত গ্রহণী-রোগাক্রান্ত থাকিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। বিপুল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও রোগের প্রবল আক্রমণে শেষ জীবনে কিছুমাত্র শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে কাশীবাসে মনন করিয়া নৌকাপথে কাশী-যাত্রা করিলেন। ভবিতব্য অখণ্ডনীয়। এই তীর্থযাত্রাই তাঁহার

তীর্থ যাত্রায় মহাযাত্রা।

মহাযাত্রায় পরিণত হইল। ৺কাশীধামে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে তাঁহার জীবন বায়ু নিঃশেষিত হইয়া গেল।

চতুর্থ সর্গ।

লক্ষ্মী দেব্যা।

কাশীকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের পরলোক-গমনের পর তদীয়া পত্নী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী লক্ষ্মী দেব্যা স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই দয়াবতী। দয়া এবং ক্ষমা তাহাদের অঙ্গের ভূষণ। লক্ষ্মীদেব্যা ঠাকুরাণীর স্বভাব-সিদ্ধ করুণা-বিটপীর সুশীতল ছায়া এবং অভয়-বাণী প্রাপ্ত হইয়া প্রজাপুঞ্জ অনায়াসেই স্বর্গীয় কর্ত্তার শোক, বিস্মৃতির অতল-গর্ভে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল। পরিবর্ত্তন-জনিত আর কোন অভাব বোধ করিল না।

লক্ষ্মী দেব্যাও প্রজাপুঞ্জের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া ভর্ত্তার অভাবজনিত দুর্ব্বিষহ শোকরাশি হৃদয়ের এক নিভৃত-কক্ষে কঠিনতার সুদৃঢ় আবরণে লুক্কাইত রাখিয়া অতি মনোযোগের সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

দেওয়ান রুদ্রনাথ বাগছী।

রাজ্যশাসন ব্যাপারে দেওয়ান রুদ্রনাথ বাগছী মহাশয় তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। বাগছী মহাশয়ের বাড়ী টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বড়বাশালিয়া গ্রামে;—সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে ইঁহার জন্ম। বাগছী মহাশয় স্বর্গীয় কর্ত্তার আমল হইতেই অতি বিশ্বস্ততা এবং ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা, সদাশয়তা এবং সৌজন্যে অধীনস্থ কার্য্য-কারকগণ ও প্রজাপুঞ্জ নিতান্তই বাধ্য

ছিল। সুতরাং লক্ষ্মীদেব্যা ঠাকুরাণী এরূপ সুযোগ্য দেওয়ানের হস্তে রাজ্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, সন্দেহ কি?

কিয়দ্দিবস সুশৃঙ্খলা সহকারে রাজ্য পরিচালনের পর, কর্ত্রী ঠাকুরাণী নিজের দৈহিক অনিত্যতা উপলব্ধি করতঃ একটু উদ্বিগ্না হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অভাবে এই বিশাল রাজ্য কে ভোগ করিবে,—সন্তান-সমতুল্য প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণই বা কে করিবে,—ইত্যাদি নানাবিধ দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মাণা হইতে লাগিলেন।

সুচতুর দেওয়ানজী তাঁহার আন্তরিক চিন্তার ভাব বুঝিতে পারিয়া দত্তকপুত্র-গ্রহণে যুক্তি প্রদান করিলেন এবং নিজেও তজ্জন্য চেষ্টিত হইলেন।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মী দেব্যা, শুভদিন—শুভক্ষণে, অতীব জাঁক জমক সহকারে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন। এই প্রথম দত্তকের নাম চন্দ্রকান্ত। ইনি দেখিতে অতি সুশ্রী ছিলেন। যদিও বেশী দিন তাঁহার অদৃষ্টে সুখ-সম্ভোগ ঘটে নাই,

প্রথম দত্তক চন্দ্রকান্ত।

তথাপি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ে অহঙ্কারের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। দেওয়ান কিম্বা অন্য কোন কার্য্যকারক কদাচিৎ কার্য্য ব্যপদেশে তাঁহাকে দেখিয়া না দাঁড়াইলে, তিনি বাল্য-হৃদয়েও অপমান বোধ করিতেন এবং গর্ব্বস্ফুরিত বাক্যে মাতার নিকট সে দুঃখ বর্ণনা করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন।

চরিত্র।

যাহা হউক, দত্তক গ্রহণের পর, ভবিষ্যদ্বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, লক্ষ্মী দেব্যা পারলৌকিক কার্য্যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে মহাভারত পাঠ উপলক্ষে 'দানসাগর' আরম্ভ করিলেন। কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, তৈলিঙ্গ, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইলেন।

মহাভারত পাঠ দানসাগর।

নানা দিগেদশ হইতে লোক-স্রোত আসিয়া মুক্তাগাছায় একত্রিত হইতে লাগিল। মুক্তাগাছার পূর্ব্বদক্ষিণদিকস্থ ঢুলয়া-বিলের শুষ্ক প্রান্তরে সারি সারি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া সমাগত মানবমণ্ডলীর অভ্যর্থনা করা হইল। সহরে প্রবেশ করিবার প্রতি প্রকাশ্য রাস্তায় একএকটা ভাণ্ডার-গৃহ স্থাপন করতঃ আগন্তুক জনসাধারণের আহার্য্য দ্রব্য বিতরিত হইতে লাগিল। দেওয়ানজীর সুব্যবস্থা গুণে জাতি-নির্ব্বিশেষে সমাগত মানবমণ্ডলী, উপযুক্ত আহার্য্য এবং বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া পঠিত মহাভারতের সুললিত মধুর ভাবস্রোতে বিগলিত-চিত্তে পুণ্যশীলা লক্ষ্মী দেব্যার কীর্ত্তিগাথা প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল।

এই ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্যাদি নির্ম্মিত ধাতব দ্রব্য এবং বহুমূল্য বস্ত্র বিতরিত হইয়াছিল। দানগ্রহীতারা পূর্ব্ব বঙ্গে আর কখনও এরূপ দান গ্রহণ করে নাই বলিয়া প্রভূত প্রশংসা করিয়া গিয়াছে। এখনও বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রাচীন লোকের নিকট লক্ষ্মী দেব্যার সেই অসাধারণ কীর্ত্তিগাথা শ্রুত হওয়া যায়। এই ব্যাপার তিন মাস কাল স্থায়ী ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহ।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে দারুণ সিপাহী-বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নানা সাহেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের উদ্দীপনা-বলে প্রজ্বলিত সমর-বহ্নির ভীষণ গর্জ্জনে ভারতবাসী, ইংরেজগণের প্রাণ মুহুর্মুহু বিকম্পিত হইয়াছিল। এই ভীষণ বিদ্রোহানল এক স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না,—বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্ত বিত্রাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। ময়মন সিংহের কলেক্টার মিঃ এ, ডি, এইচ্, স্কেলচ্ সাহেব স্বজাতীয় স্ত্রী পুরুষের রক্ষার জন্য মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কোথাও উপযুক্ত আশ্রয় পাইতেছিলেন না।

আশ্রয় দান।

এই সময় আমাদের দয়াবতী লক্ষ্মী দেব্যা ঠাকুরাণী নির্ভীকচিত্তে সন্ত্রাসিত ব্যক্তিগণকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিজ-বাটীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরেজ

মহিলাগণ প্রাণভয়ে দলে দলে অন্দরে এবং পুরুষগণ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া জীবন রক্ষা করিল। ইংরেজ জাতির পক্ষে লক্ষ্মী দেব্যার এই সহৃদয়তার স্মৃতি চিরস্মরণীয় !!

চন্দ্রকান্তের পরলোক প্রাপ্তি।

নিয়তি কাহারও বাধ্য নহে। কাল পূর্ণ হইলে প্রস্ফুটিত বা মুকুলে কোন প্রভেদ থাকে না। কিছুদিন রাজভোগের পর দুর্ভাগ্য চন্দ্রকান্তের কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। ষোলকলা পূর্ণ না হইতেই ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে দত্তক চন্দ্রকান্ত কাল-রাহুর করাল-কবলে কবলিত হইলেন,—কুসুম ফুটিতে না ফুটিতেই দুরন্ত-কাল-কীট আসিয়া সহসা বৃন্ত-চ্যুত করিয়া ফেলিল।

লক্ষ্মী দেব্যা, এই বৃদ্ধ বয়সে যে আশাসূত্র অবলম্বন করিয়া ধীরে,—অতি ধীরে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে ছিলেন, নিয়তির আকস্মিক চক্র ঘূর্ণনে সহসা তাহার সেই সূক্ষ্ম সূত্রগাছি ছিন্ন হইয়া গেল,—তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আবার ভবিষ্যচ্চিন্তার ঘনান্ধকারে সংসার আঁধার দেখিতে লাগিলেন।

এই সময় দেওয়ানজী বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া প্রভূত চেষ্টাবলে তিন চারি মাস মধ্যেই অপর দত্তক পুত্র নির্ব্বাচন করতঃ দত্তকের পিতা মাতা প্রভৃতি সহকারে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট লইয়া আসিলেন। তদ্দর্শনে তিনি কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া তদায়োজনে অনুজ্ঞা করিলেন।

রজনীকান্ত।

প্রথম সর্গে বর্ণিত ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী বাজিৎপুর গ্রাম-নিবাসী বৃদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথা পাঠক-পাঠিকার স্মৃতি-পটে অঙ্কিত থাকিতে পারে। মজুমদার মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র রজনীকান্ত অতি রূপবান ছিল। প্রথমতঃ তাহাকেই দত্তকরূপে আনয়নের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ রজনীকান্ত অল্পায়ুঃ বলিয়া তাহার ভাগ্যে রাজ-প্রাসাদ ঘটিল না।

সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ সমভাবে পরিচালিত হইলেও কনিষ্ঠের প্রতিই বেগ একটু বেশী পড়িয়া থাকে। মজুমদার-পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে দত্তক দিতে অস্বীকৃতা হইলেন। অথচ মুক্তাগাছার আচার্য্য-বংশে সন্তান দেওয়ার জন্য মজুমদার মহাশয়ের ঐকান্তিকী বাসনা। সুতরাং অগত্যা দ্বিতীয় পুত্র রাজকুমারকে দেওয়াই স্থির করতঃ সপরিবারে বাগচী মহাশয়ের সহিত মুক্তাগাছা আগমন করেন।

রাজকুমার।

রাজকুমার এবং পূর্ণচন্দ্র—উভয়ের মধ্যে রাজকুমারের বয়োধিক্য বশতঃ লক্ষ্মী দেব্যা ঠাকুরাণী তাহাকে গ্রহণ করিতে আন্তরিক অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক অভিমত করিলেন যে, উভয়ের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে আসিবে, তিনি তাহাকেই দত্তকরূপে গ্রহণ করিবেন। ভগবানের কি চক্র, বিধাতার কি অখণ্ডনীয় ভাগ্যলিপি!! রাজকুমার দাঁড়াইয়া চারিদিকে অট্টালিকার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ব্যাপৃত রহিয়াছে, ইত্যবসরে ভাগ্যবান পূর্ণচন্দ্র 'মা, মা' শব্দে হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মী দেব্যার ক্রোড়ে উপবেশন করিল। তিনিও তাহাকে সস্নেহে সন্তান-সম্বোধনে শিরশ্চুম্বন করিলেন। *

পূর্ণচন্দ্র।

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় বাধা দেওয়া ক্ষুদ্র মানবের অসাধ্য! সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী অগত্যা তাঁহার বার্দ্ধক্যের স্নেহ-সঞ্চিত ধন পূর্ণচন্দ্রকেই দিতে বাধ্য হইলেন। মহা সমারোহে সম্প্রদান কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। লক্ষ্মী দেব্যার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে আবার পূর্ণ চন্দ্রের বিকাশ হইল;—রাজ্যময় একটা আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়া গেল। কর্ত্রী ঠাকুরাণী এই

সূর্য্যকান্ত।

* প্রাচীন কিংবদন্তী হইতে সংগৃহীত।

দ্বিতীয় দত্তকের নাম রাখিলেন,—'সূর্য্যকান্ত'। এই সময় ইহার বয়স সাত বৎসর মাত্র।

লক্ষ্মী দেব্যা ১৮৫১ খৃঃঅব্দে পৌষ-নারায়ণী-স্নান উপলক্ষে করতোয়া-তীরে যাওয়ার সময় কিয়দ্দিবস চাঁপাপুর কাছারীতে অবস্থান করতঃ এবং এক প্রবস্ত স্বর্ণ-বিনির্ম্মিত মূল্যবান্ অলঙ্কার দ্বারা ৺জগন্মাতাকে সুসজ্জিত করিয়া অতি জাঁক জমকের সহিত তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তৎপর ৺কামাখ্যা দেবী দর্শনে আসাম অঞ্চলে যাইয়া ৺কামাখ্যা দেবীকে স্বর্ণনির্ম্মিত মুকুট প্রদান করিয়া আইসেন।

তীর্থ পর্য্যটন।

'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননীর নাম স্মৃতি-পটে জাগরূক রাখিবার উদ্দেশে লক্ষ্মী দেব্যা ঠাকুরাণী মুক্তা-গাছার বিমলা দেব্যা প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের বাম ভাগে একই অনুকরণে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে এক মন্দির প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে 'আনন্দময়ী' কালী স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে উহা 'কালী বাড়ী' নামে সর্ব্বজন-পরিচিত। *

দেবতা প্রতিষ্ঠা।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে পুণ্যশীলা প্রাতঃস্মরণীয়া লক্ষ্মী দেব্যা ঠাকুরাণী নাবালক সূর্য্যকান্তকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করেন।

* ৺আনন্দময়ী কালীর মন্দিরে একখণ্ড প্রস্তর-ফলকে লিখা আছে :—

"অশীতি মিত্র মাশাকে কাশীকান্তস্য ভাবিনী।
নির্ম্মমে শ্রীমতি লক্ষ্মীঃ শ্রীমৎকালীনিকেতনং॥
সন ১২৬৫।

পঞ্চম সর্গ।

—:০:—

সূর্য্যকান্ত বাবু।

জীব জগতে নিয়তির' দুর্দ্দমনীয় তেজঃ—অপরিসীম প্রতাপ !! জীব মাত্রেই নিয়তির অধীন ; সে অধীনতা-শৃঙ্খলের কঠিন বন্ধন ছিন্ন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ত্রিদিবেশ্বর অমরনাথও নিয়তির হস্ত হইতে ত্রাণ পান নাই। তুমি সুখেই থাক, আর দুঃখের কঠোর নিষ্পেষণে অস্থি চর্ম্ম সারই হও,—নিয়ত সুরম্য-হর্ম্ম্য-তলে দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন এবং সুখ-সেব্য উত্তম দ্রব্যাদি অশনে নিজকে অমর বলিয়াই প্রতিপন্ন কর, অথবা বৃক্ষতলে গলিত-পত্র-শয্যায় শায়িত থাকিয়া অনশনে জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবরে দুঃখের চরম-সীমাবলোকন করিতে করিতে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদানই কর, কালপূর্ণ হইলেই নিয়তির সহিত সাক্ষাৎ হইবে,—মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব না করিয়া ইহ ধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। শত অশ্বমেধেও নিয়তির কঠোর শাসন শিথিল হইবে না।

আমাদের পুণ্যশীলা প্রাতঃস্মরণীয়া লক্ষ্মীদেব্যা এ জগতে লক্ষ্মীস্বরূপিণী হইয়াও নিয়তির সেই অপরিহার্য্য নেমী-সংঘর্ষণে জীবনী শক্তি মহাশক্তিতে মিশাইলে পর বালক সূর্য্যকান্ত চতুর্দ্দিকে কি যেন—কেমন একটা বিষাদের করাল ছায়া নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। এতদিন তিনি স্নেহের পুত্তলিরূপে স্নেহের সুশীতল ছায়ায় প্রতিপালিত হইতেছিলেন,—সহসা প্রবল প্রভঞ্জন-বিত্রস্ত সে সুখ-মহীরুহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হওয়ায় ধূলি-ধূসরিত আকাশ-পথে বিষাদ-কালিমা-

চিত্রিত ভীতির ভীম-ভাবে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল ;—তিমিরে আরও তিমির মিশিয়া গেল।

সূর্য্যকান্ত সবেমাত্র ১২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন,—এখনও বালক। রাজ্য-রক্ষার উপযোগিতা এখনও জন্মে নাই। তাই মহামান্য সরকার বাহাদুর রাজ্যরক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করতঃ সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীন করিয়া অতি সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নাবালক সূর্য্যকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ওয়ার্ড-ইনষ্টিটিউশনে প্রেরিত হইলেন।

কোর্ট অব্ ওয়ার্ড।

মুহূর্ত্তের অস্তিত্ব মুহূর্ত্তে বিলয় প্রাপ্ত হইতে না হইতেই যেন-কি এক অভাবনীয় মন্ত্রোচ্চারণে কত কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল,—দেখিতে দেখিতেই যেন সুখ-স্মৃতির অভ্যুত্থান কি এক মন্ত্র-কুহকে জল-বুদ্বুদের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে বিস্মৃতির গভীর গর্ভে বিলীন হইয়া গেল! কিছুই বুঝিবার সাধ্য নাই। নিয়তির কার্য্য, নিয়তিই ভাল জানে। মোহমুগ্ধ ভাগ্যফল-প্রত্যাশী মানবের সে রহস্যোদ্ঘাটন করিবার শক্তি কোথায়?

ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনে কেবল জমিদার শ্রেণীর লোকই শিক্ষার জন্য আহূত হইয়া থাকেন,—সর্ব্বসাধারণের স্থানলাভ ঘটিয়া উঠে না। যাহাদের সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে যায়, একমাত্র তাহারাই এখানকার শিক্ষার্থী। সুতরাং এখানকার বিদ্যাদেবীও লক্ষ্মীর বিলাস-বিভ্রান্ত গজেন্দ্র-গমনানুকরণে বাধ্য। সূর্য্যকান্ত এই ইনস্টিটিউশনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ন্যায় অনেক নাবালক ধনী সন্তান তথায় একত্রিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আর ক্ষোভ করিবার বিশেষ কিছুই রহিল না।

ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন।

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এই ওয়ার্ড ইনস্‌টিটিউশনের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। শিক্ষার্থিগণ এই মহাত্মার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিত। ইনি যেমন সম্ভ্রান্ত, তেমনই সদাশয় ছিলেন। অনেক ধনী সন্তান সৎশিক্ষা ও সদুপদেশের জন্য ইহাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা-সূত্রে আবদ্ধ। আমাদের নাবালক সূর্য্যকান্ত এখানে আসিয়া এই মহাত্মার আশ্রয়লাভে স্বজনাভাবজনিত দুঃখ অনেকাংশে ভুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যকান্তকে অধিক স্নেহ করিতেন। ইনি সূর্য্যকান্তকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিয়া নানা উপদেশচ্ছলে রাজোচিত গুণালঙ্কৃত করিয়াছিলেন। একথা মহারাজা সূর্য্যকান্ত সময় সময় গল্পচ্ছলে প্রকাশ করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সূর্য্যকান্ত বাবু ওয়ার্ড ইনস্‌টিটিউশনে প্রবেশ করতঃ রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের ন্যায় মহাত্মার আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু দেওয়ানজীর প্রাণে ঘোর অশান্তি। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের কার্য্যে তিনি নিতান্তই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মনিব ছাড়িয়া পরের শাসন-রজ্জুতে আবদ্ধ থাকা তাঁহার ন্যায় প্রতিভা-সম্পন্ন দেওয়ানের অসহ্য। তাই যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র রাজ্যভার পরহস্ত হইতে নিজ মনিবের হস্তে পড়িয়া এ বিষাদাঙ্কের যবনিকা-পতন হয়, এমত গভীর গবেষণায় মনোনিবেশ করিলেন। বালক সূর্য্যকান্তকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনেকটা সুযোগ ঘটিতে পারে বিবেচনায় সম্বন্ধ নির্ণয়ে বহির্গত হইলেন।

দেওয়ানের কর্ত্তব্য।

রাজসাহী জিলার অন্তঃপাতী কলম নিবাসী ৺ভবেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজরাজেশ্বরী দেবীই পরিদৃষ্টা কন্যাগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। তাহার সেই অর্দ্ধস্ফোটোন্মুখী শিশির-সিক্ত গোলাপ-কলিকা-লাঞ্ছিত স্থির সৌন্দর্য্য-জ্যোতিতে চিত্ত-বিনোদন-লাবণ্য-

প্রভার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় বিভায় দেহ-লতা বিভূষিত! সে অলৌকিক অঙ্গ-সৌষ্টব—সে প্রীতিপ্রদ কষিত-কাঞ্চন-কান্তি, জগতে অতুল! সুবিস্তৃত-নিতম্ব-চুম্বি-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপের সৌন্দর্য্যাবলোকনে স্বতঃই মনে হয়, সম্ভবতঃ কবি এইরূপ কেশপাশ নিরীক্ষণ করিয়াই মৃদু মধুর স্বরে গাহিয়াছিলেন,—

"সুন্দর চিক্কণ বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী বিবরে লুকায়।"

রাজরাজেশ্বরী দেবী।

কুমারীর সেই সুস্নিগ্ধ লাবণ্য-ছটায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় না,—কিম্বা চক্ষুও ঝলসিয়া যায় না! ইহা অতি স্নিগ্ধ—অতি চিত্ত-বিনোদন! এ লাবণ্য দর্শনে প্রাণ বিলাস-বিভ্রমে মাতিয়া যায় না, বরং শান্তির সুশীতল ছায়া জ্ঞানে মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তি রসের আবির্ভাব হয়। সুতরাং ধর্ম্ম-বুদ্ধি বৃদ্ধ বাগচী মহাশয়ের পবিত্র অন্তঃকরণ যে, সেই দেবী-রূপিণী সুর-সুন্দরীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য-সিঞ্চিত-শান্তি-সুধা-পানে বিহ্বল হইবে, সন্দেহ কি?

বিবাহ।

বৃদ্ধ দেওয়ানজী আর কালবিলম্ব না করিয়া সূর্য্যকান্তের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রী বিবেচনায় এই কুমারীর সহিতই শুভক্ষণে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। শুভক্ষণে, শুভদিনে বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বৃদ্ধ দেওয়ানজী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। বিধাতার কি অপূর্ব্ব মিলন! নামের সঙ্গে অদৃষ্টেরও সংযোগ!! রাজরাজেশ্বরী দেবী, বাস্তবিকই রাজরাজেশ্বরী হইলেন।

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্ত হইতে মুক্তি।

বিবাহের পর বালক সূর্য্যকান্তের নাবালকত্ব ঘুচিয়া গেল। সরকারবাহাদুর কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধান হইতে যাহার সম্পত্তি তাহারই হস্তে অর্পণ করিলেন।

এই সময় বৃদ্ধ দেওয়ান রুদ্রনাথ বাগছী মহাশয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক বাটী গমন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র বাগছী মহাশয় দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হইলেন।

নূতন দেওয়ান।

ষষ্ঠ সর্গ।

—:*:—

রাজ্যাভিষেকে।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সূর্য্যকান্ত বাবু কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্ত হইতে স্বীয় সম্পত্তি মুক্ত করিয়া সস্ত্রীক মুক্তাগাছা শুভাগমন করিলেন এবং রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

তখন তাঁহার দেহ-রাজ্যে যৌবন-বসন্তের সমাগম,—সুখের মৃদু-মন্দ-মলয়-হিল্লোলে প্রাণ মাতোয়ারা! যে ব্যক্তি এতদিন পরের বিধিসিদ্ধ নিয়ম প্রণালীতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিঞ্জরা-বদ্ধ পাখীর ন্যায় সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ ছিলেন,—ইচ্ছা থাকিলেও যে ব্যক্তি, বাহিরের উন্মুক্ত সমীর-প্রবাহে গা' ঢালিয়া স্বাধীন ভাবে পরিভ্রমণ করিতে পারেন নাই, তিনি আজ বিপুল সুখৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন বিশাল রাজ্যের একমাত্র অধিপতি; অপরিসীম ধনরত্ন-সমন্বিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজ তাঁহার সম্মুখে মুক্তদ্বার;—শ্যাম-শোভন-শষ্প-সজ্জিত মলয়-সমীর-স্নিগ্ধ সুবিস্তৃত লীলাক্ষেত্র তাঁহার বিলাস-বিভ্রান্ত অক্ষিগোলকের সম্মুখে প্রসারিত;—সুখের সীমা কি?

রাজকার্য্য পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু বিলাসিতার ঢেউ লাগিতে আরম্ভ করিল,—ক্রমে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ,—তদুপরি তরঙ্গ

আসিয়া তাঁহার সেই কার্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিল! বিলাসিতার বিলোল কটাক্ষে হৃদয় স্থির রাখিতে পারিলেন না। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়কন্দরে আনন্দ-কুসুম স্তরে স্তরে বিভূষিত,—প্রীতির নীহার-স্নাত ফোটোন্মুখ সুখ-গোলাপ ধীরে ধীরে প্রাণে প্রাণে যে সোহাগ-মদিরা ঢালিয়া দিতেছে,—নব যৌবন সমাগমে হৃদয়ে যে আবেশময় ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাতে বাধা মানিবে কেন? এরূপ সুখের সময়ে কার্ প্রাণ স্থির থাকিতে পারে? সুতরাং তিনিও পারিলেন না। বসন্তের আশু-সুখোদ্ভাসিত প্রীতিহিল্লোলে গা' ঢালিয়া ফুল্ল-কুসুম-শয্যায় অনায়াসে আবেশে অবশ অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। প্রলোভনের মোহিনী-মূর্ত্তি সন্দর্শনে আত্মসংযম বিদূরিত হইয়া গেল। সময় বুঝিয়া তাঁহার অযত্ন-প্রক্ষিপ্ত মধুর আস্বাদনে চতুর্দ্দিক হইতে ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় ইয়ারপুঞ্জ আসিয়া জুটিতে লাগিল। যুবক সূর্য্যকান্ত রাজকার্য্য ভুলিয়া—বিষয়-বিবেক ছাড়িয়া, অনায়াসে আমোদের রঙ্গে ভঙ্গে বিলাসিতা কূপে নিমজ্জিত হইলেন;—বিষয়ের মধুর আস্বাদনে মন বড় ভিজিল না। অল্প সময় মধ্যেই সূর্য্যকান্ত যথার্থ "বাবু" সাজিয়া বসিলেন।

যৌবন মানব-জীবনে এক ঘোরতর সমস্যা,—সুখ-দুঃখের সন্ধিস্থল। নর-সঙ্ঘ যখন কৈশোরের সুকুমার ভাব-নিচয়, অতীতের গর্ভে লুক্কাইত রাখিয়া যৌবনের উন্মত্ত-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিবার উপক্রম করে, তখন তাহার কোমল-প্রাণ সরলতার শুভ্র-আলোকে বিভাসিত থাকে,—কুটিল-তার তীব্র তেজঃপুঞ্জে বিচলিত হয় না। কিন্তু সেই সুকুমার বৃত্তিগুলি চিরদিন এক ভাবে থাকে না; সম্মুখে লীলা কৌতুকের ললিত-লাবণ্য-সন্দর্শনে লালসার তীব্র-স্রোতে পড়িয়া লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়। এই স্থান হইতেই জীবন-স্রোত দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম-স্রোতে বিভক্ত হইয়া পরিশেষে মহাকাল-স্রোতে নিঃশেষিত হইয়াছে। একটি স্রোতে সরলতা, সদ্বুদ্ধি,

বিবেক, আত্মসম্মান, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় পুণ্য-মীন-রূপে স্থানে স্থানে ভাসমান,—কিন্তু স্রোতোবেগ অতি ধীর! আত্ম-সংযম ও হৃদয়ের বল না থাকিলেও পথে বিচরণ করা অতীব কঠিন। অন্য স্রোতে হিংসা-দ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি পুরীষ-প্রতিম পৈশাচিক বৃত্তিগুলি পাপ-কৃমি-সাজে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; এ প্রবাহ অতি খরতর গতিতে বীভৎস-ভৈরব নিনাদে নিনাদিত হইয়া প্রবাহিত;—বিলাস-বিভ্রমে শক্তি-হীনা-বস্থায় আবেশে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেই অলক্ষিতে কি এক মহা তিমিরাবৃত সঙ্কটময় স্থানে ভাসাইয়া দিবে।—বাধা বিঘ্ন কিছুই মানিবে না। যিনি যৌবনের প্রথম সোপানে পদস্থাপন করিবার সময়েই জ্ঞানালোকে বিবেকরূপ মহাপুরুষের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া সহিষ্ণুতা-বলে পুণ্য-প্রবাহে অঙ্গ ভাসাইতে পারেন, তিনিই সংসার-সাগরে সুখের ভেলায় আরূঢ় হইয়া শান্তিময়ের শান্তি-ধামে অক্ষয়-কীর্ত্তিসহ বিরাজ করিতে পারেন। তাহা না হইলেই বিপদ্! প্রলোভনের লীলা-ললিত ভাব-হিল্লোলে উন্মত্ত সাজিয়া কুসুমায়ুধের ফুল্ল কুসুম-নিষেবিত কার্ম্মুক-ক্ষেপণে বিলাসিতার বিলোল কটাক্ষে আত্মহারা হইয়া পাপ-স্রোতে গা' ঢালিয়া দিলে, পরি-ণামে গলিত-রক্ত-মাংস-সমন্বিত বৈতরণীর খর-স্রোতে জীবন-স্রোত মিশাইয়া অনন্তকাল পিশাচ-নিনাদিত নরকের মহা কুম্ভিপাকে বিঘূর্ণিত হইতে হয়। তাই বলি, যৌবন জীবনের সন্ধিস্থল! বিশেষ বিবেচনার সময়!! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে আসিয়া অনেকেই আত্মহারা হইয়া পড়েন। আশু সুখদ প্রস্ফুটিত কুসুমের ক্ষণিক হাসিতে অনেকেই প্রাণ মাতাইয়া দেন বটে, কিন্তু তন্নিহিত ভীষণ ধ্বংস-কীটের প্রতি কেহই বড় একটা লক্ষ্য করেন না। সূর্য্যকান্ত বাবুও করিলেন না, যৌবনের মোহময় আবেশে সুকোমল কুসুমশয্যা জ্ঞানে ভীষণ বিষ-ধরের অঙ্গে গা' ঢালিয়া দিলেন। দিবারাত্র আহ্লাদ,—অহর্নিশি ইয়ার-প্রসঙ্গে প্রীতি-প্রসঙ্গ। কার্ রাজ্য কে রক্ষা করে? পূর্ব্বপুরুষের

কষ্টার্জ্জিত অর্থরাশি দোলযাত্রার আবির-রাশির ন্যায় উড়িতে লাগিল। সে উদ্দাম প্রবাহের নিকট কোন বাঁধই খাটিল না।

কুসুম ফুটিলেই সৌরভ-লোভে চতুর্দ্দিক হইতে অলিকুল জুটিয়া থাকে,—কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে হয় না।

ইয়ার সঙ্গ।

সূর্য্যকান্তের বিলাসিতার সংবাদ পাইয়া, বহু বন্ধু বান্ধব জুটিয়া গেল। তাহাদের অনর্থক হাস্য-তরঙ্গে,—অর্থশূন্য "দিল্লি লক্ষ্ণৌ" টপ্পার খর-স্রোতে দু'দিনেই বৈঠকখানা সরগরম হইয়া উঠিল। কেহ বা মৌখিক মিথ্যা গুণ-কীর্ত্তনে যুবক সূর্য্যকান্তকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" করিয়া তুলিতেও ছাড়িল না। হায়, ধনের কি মোহিনী শক্তি,—বিলাসিতার কি বিবেকশূন্যতা! চাটুকারগণের ঐরূপ মিথ্যা প্রশংসা যে, কেবল স্বার্থ-সিদ্ধির মুখস মাত্র, একথা অনেক ধনী যুবকই বুঝিয়াও বুঝেন না!!

এই বিলাসিতার বিলোল কটাক্ষে কত রাজ্য,—কত রাজা,—কত ধনী, অকালে কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে;—কত বুদ্ধিমানের বুদ্ধি,—বিবেকীর বিবেক,—ধনীর ধন, ধূলিরাশির ন্যায় শূন্যে উড্ডীয়মান হইতেছে; তথাপি কাহারও চৈতন্যোদয় হইতেছে না! কি আশ্চর্য্য!! নিরন্নকে এক মুষ্টি তণ্ডুল-বিতরণে অনুরোধ করিলে যাহার হৃৎপিণ্ডের শোণিত পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, পক্ষান্তরে তিনিই আবার বিলাসিনীর বঙ্কিম-কটাক্ষ-ঈক্ষণে আত্মহারা হইয়া তৎপাদপদ্মে প্রভূত অর্থাঞ্জলি দিতেও কিছুমাত্র কষ্ট জ্ঞান করেন না! হায়রে কালের ধর্ম্ম!!

পাপ ব্যসনা-শক্তিতে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইতে পারে, কিন্তু ভিক্ষুকের প্রতি একটী পয়সারও করুণা ক্ষরিত হইতে পারে না; এই ত দেশের অবস্থা! যাহাদের প্রতি লক্ষ্মীর অসীম করুণা,—যাহারা দেশের উন্নতি কার্য্যে একমাত্র সহায়, তাহাদেরই যদি এরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা হইলে "অন্যে পরে কা কথা?" স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঘৃণিত বিলাসিতা-কর্দ্দমে গাত্র

প্রোথিত রাখিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলে পর অদৃষ্টের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া মঙ্গলময় ভগবানের নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবে,—এ কেমন বিচার? কৃতকর্ম্মে দোষারোপ না করিয়া অদৃষ্টে দোষ দিলে লাভ কি? কর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্ম;—ধর্ম্ম নিজেও কর্ম্মের অধীন,—কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্ম হয় না। নিজের উন্নতি, জাতির উন্নতি—দেশের উন্নতি,—যে কোন উন্নতির কামনা থাকে কর্ম্মকে সারথি করিয়া অগ্রসর হও, সমস্তই হইবে। বিষয়ীর বিষয়,—জ্ঞানীর জ্ঞান,—ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম,—বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, সমস্তই কর্ম্ম-বলে উন্নত হইয়া থাকে। কর্ম্মহীনতা এবং বিলাসিতার আধিক্যই দেশের দুরবস্থার একমাত্র কারণ।

যাহা হউক, সূর্য্যকান্ত বাবুকে এ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য দেওয়ান গোবিন্দ বাগছী মহাশয় প্রভৃত চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই আর পারিয়া উঠিলেন না। তিনি ক্রমেই ডুবিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা একদিন সামান্য একটী ঘটনায় তাঁহার জীবনাঙ্ক পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল,—হৃদয়ে প্রভূত বলের সঞ্চার হইল। ঘটনাটী সামান্য হইলেও, তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে অতীব মূল্যবান্, তাই পাঠকগণকে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

একদিন তিনি ইয়ারদলে পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ-স্রোতে ভাসিতেছেন,—চাটুকারবৃন্দের মুখ-নিঃসৃত স্তুতির মলয়-হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া আহ্লাদে বিভোর হইতেছেন, এমন সময় সহসা কে যেন মোহ-মদিরার মত্তভাবলে বলিয়া ফেলিল,—"গরিব যদি কম্বলে বসে, সে মার্গ চুলকায় আর হাসে।" প্রবল আনন্দ-স্রোতে কথাটী চাপা পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু সূর্য্যকান্তের শ্রুতি ভুলিতে পারিল না। ক্রমে তাহা বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় হৃদয়ের প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া বিবেকের রাজ্যে এক বিষম গোল বাধাইয়া দিল।

আমোদ-স্রোত থামিয়া গেল। ক্রমে ইয়ারগণ একে একে টলিতে

টলিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বৈঠকখানা নীরব!—নিস্তব্ধ! বিমর্ষ-চিত্ত সূর্য্যকান্ত একাকী নীরবে বসিয়া রহিলেন। ইয়ারের প্রমুখাৎ উপহাস বাক্যটী শ্রবণ অবধি তাঁহার হৃদয়ে চিন্তার প্রবল প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইতেলাগিল। বিষাদ-কালিমায় বদন-চন্দ্রমা মলিন। প্রাণে কি এক ওতপ্রোত ভাব! কিছুই ভাল বোধ হয় না। কথাটী কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কেন বলা হইল—এইটীই তাঁহার চিন্তার প্রধান লক্ষ্য। চিন্তার পর চিন্তা, ক্রমে বহু চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময় দেওয়ানজীর কথা মনে হইল। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত বিষয়ই আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন।

দেওয়ান গোবিন্দ বাগছি মহাশয় দেখিলেন, এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত—সদ্‌যুক্তি ফলাইবার ইহাই মাহেন্দ্র ক্ষণ! তিনি কথাটীর ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন,—"আমাকে জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন! কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা ত নিজেই বুঝিতে পারেন। নিজের জীবনে, অতীত ও বর্ত্তমানে তুলনা করিলেই ত বোধগম্য হয়। আমি কতবার বলিয়াছি, গ্রাহ্য করেন নাই; এখন নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন!"

মনস্বী সূর্য্যকান্ত এইবার দেওয়ানজীর কথার মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইলেন। দেওয়ানজীর কথাগুলি তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়া গেল; নিজের ভ্রম নিজে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে, এখন কি কর্ত্তব্য?"

তাহার অবস্থা দৃষ্টে দেওয়ানজী একটু সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তর করিলেন,—"সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মই এখানকার যথাসর্ব্বস্ব! কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সুতরাং কেবল বিলাসিতা-স্রোতে গা ঢালিয়া কর্ম্ম-বিহীন হইলে মনুষ্যত্ব থাকিবে কেন? রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করতঃ কাজ কর্ম্ম দেখুন,—বিশ্রামের সময় সজ্জন সহবাসে অতিবাহিত করুন; আর্থিক মানসিক উভয়বিধ উন্নতিই সংসাধিত হইবে।"

দেওয়ানজীর উপদেশ বাক্যগুলি বিবেক-বিত্রাসিত সূর্য্যকান্তের প্রাণে প্রস্তর-ফলকে খোদিত অক্ষরের ন্যায় অঙ্কিত হইয়া গেল। আর ভৃঙ্গসম ইয়ার দলে পরিবৃত হইয়া বিলাসিতা-স্রোতে গা ঢালিয়া অধঃপাতের চরম সীমাভিমুখে অগ্রসর হইবেন না বলিয়া মনে মনে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ সূর্য্যকান্ত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে উপদেশ হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং কর্ম্মের লীলাক্ষেত্র এই সংসারক্ষেত্রে দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রমসহকারে কর্ম্মের সাধনা করিয়া জগতে কর্ম্মবীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

দেওয়ানজীকে বিদায় দিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে গান বাদ্যের উপকরণগুলি ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরদিন ইয়ারগণ সমাগত হইলে তাহাদিগকে চিরবিদায় দিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এই হইতেই তিনি ক্রমে পুরুষকারের পরিচয় দিয়া উন্নতিমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। এইটী তাঁহার জীবনের এক শুভ মুহূর্ত্ত !! *

মানবের জীবনাঙ্কে সময় সময় এমন এক একটী পট-পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, যাহাতে তাহার জীবনের পূর্ব্বাপর কোনই সম্বন্ধ থাকে না, নূতন অঙ্কের নূতন দৃশ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। জীবনে এমন শত সহস্র ঘটনা উপস্থিত হইয়া অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে—আবার যাইতেছে, তৎপ্রতি কিছুমাত্রও লক্ষ্য হয় না,—মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্ত আকর্ষিত হয় না; অথচ জীবনের উপর একটা গুরুতর ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যায়! তাহাতে মানুষ উন্নতির পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে। বিলাসী সূর্য্যকান্তেরও আজ সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত; তিনি আজ সময় পাইয়া সময়ের কর্ত্তব্যসাধনে বীরের ন্যায় স্থির-প্রতিজ্ঞ !!

---

* ৺ মহারাজা বাহাদুরের তৎসাময়িক সম্ভ্রান্তবংশীয় ইয়ার ৺হরেশ্বর সান্যাল মহাশয়ের প্রমুখাৎ এই গল্পটী শ্রুত হইয়া লিপিবদ্ধ করা গেল।

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই বিপুল সাম্রাজ্য—অগাধ ধনৈশ্বর্য্য, তাঁহার ভোগ বিলাসের সামগ্রী নহে—কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র। এখানেই তাঁহাকে কর্ম্মের সাধনা করিয়া জীবনের সার্থকতা দেখাইতে হইবে।

ক্রমে তাঁহার বিলাস-বিভ্রান্ত-হৃদয় কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত হইতে লাগিল,—ধর্ম্মরূপী বিবেক, জ্ঞানালোকে কর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিল। তিনিও সংযতচিত্তে ধীরপাদবিক্ষেপে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। এখন আর বিলাসিতার বিলোলকটাক্ষ তাঁহার নয়নে তেমন প্রীতির ছবি আঁকিয়া দেখাইতে পারে না, ইয়ার দলের আপাতমধুর কথায় এখন আর তাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয় না। এখন তিনি একজন ঘোর বিষয়ী।

তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, এতদিন যেন কি এক রাক্ষসী-মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, কি জানি এক ঐন্দ্রজালিকী শক্তি তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোহমুগ্ধ করিয়া ধ্বংসরূপ ভীষণ নরকের পথে লইয়া যাইতেছিল, ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। বিবেকচালিত জ্ঞান মন্ত্রোচ্চারণে সমস্ত ইন্দ্র-জাল ছুটিয়া গিয়াছে; এখন আর অজ্ঞানতারূপ কুজ্ঝটিকার মোহান্ধকারে তাঁহার দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ নহে। এখন কর্ত্তব্যের পথ চিনিয়াছেন, জীবনের উদ্দেশ্য বিলক্ষণরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

আজ কর্ত্তব্যের অনুরোধে কর্ত্তব্যের পথে বিচরণ করিতে গিয়া সূর্য্য-কান্ত যে অমানুষিক ধীরতা—অসামান্য নিস্পৃহতার পরিচয় দিলেন, তেমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অতীব দুর্ল্লভ। আজ হইতে তাঁহার জীবন-নাট্যের দ্বিতীয়াঙ্ক আরম্ভ হইল,—আজ হইতেই তিনি কর্ম্মীরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অব-তীর্ণ হইয়া কর্ম্মের সাধনা আরম্ভ করিলেন! আজ তাঁহার সুখময়-জীবন-রাজ্যের শুভ-পুণ্যাহ!!

সপ্তম সর্গ।

শিক্ষা বিষয়ে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মাতৃবিয়োগের পর সূর্য্যকান্ত বাবু শিক্ষার জন্য কলিকাতা ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার জীবনে এইখানেই আরম্ভ এবং এখানেই শেষ। এই ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে বহির্গত হইলে পর তাঁহার ভাগ্যে আর বিদ্যালয়ের শিক্ষা ঘটিয়া উঠে নাই।

ওয়ার্ড ইন্‌সৃটিটিউশন কেবল বড়লোকের আড্ডা বিশেষ। এখানে দীনহীনের স্থান অসম্ভব। যে সমস্ত ভূম্যধিকারিগণ নাবালক পুত্র রাখিয়া ইহধাম হইতে অন্তর্হিত হন, তাঁহাদের সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে নীত হয় এবং নাবালকগণ শিক্ষালাভের জন্য ওয়ার্ড ইন্‌সৃটিটিউশনে প্রেরিত হন।

ওয়ার্ড-ইন্‌ষ্টিটিউশন।

এখানকার শিক্ষার্থী বড়লোক,—আসবাব বড়মানুষী-কায়দার,—চালচলন সমস্তই বড়মানুষী; সুতরাং শিক্ষা-প্রণালীও যে, বড়-মানুষী-ধরণের হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সর্ব্বদা আরাম কেদারায় আবেশে অঙ্গ ঢালিয়া আরাম করিতে করিতে আর কতই শিক্ষালাভ ঘটিতে পারে?

বিদ্যা সাধনার ধন। কঠোর পরিশ্রমের সহিত কায়মনোবাক্যে সাধনা না করিলে বিদ্যালাভ ঘটে না। প্রতি মুহূর্ত্তে দৈহিক বা মানসিক আরাম সাধনায় অতিবাহিত করিলে বিদ্যাদেবীর করুণা লাভ অতীব দুর্লভ। ইক্ষুদণ্ডের মধুরত্ব লাভ করিতে হইলে উহা দন্ত-সংঘর্ষণে বিদীর্ণ করতঃ মিষ্টরসের আস্বাদন লইতে হইবে; দন্তে ব্যথা লাগিবে বিবেচনায় দন্ত-সংঘর্ষণের পরিবর্ত্তে দন্ত লেহনেই মিষ্টত্ব লাভ ঘটিবে না, কেবল পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র।

ওয়ার্ড ইন্‌স্‌টিটিউশনে শিক্ষা সম্বন্ধে কঠোরতা কিছুই নাই। বরং আরাম কেদারায় বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগের সহিত বিলাসিতা শিক্ষার পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়া থাকে। তবে এক মাত্র তত্ত্বাবধায়কের প্রযত্নে যাহা কিছু শিক্ষা হয়। তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়, সূর্য্যকান্তকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেন। তাঁহাকে সর্ব্বদাই নিকটে রাখিয়া নানাবিধ হিতোপদেশ দ্বারা তাঁহার জ্ঞান-বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন। এ বিষয়ে মহারাজা বাহাদুর সময় সময় কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন এবং জ্ঞানোপার্জ্জন সম্বন্ধে তিনি আজীবন মিত্র মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

সূর্য্যকান্ত বাবুর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের আদ্যন্ত যখন এই ওয়ার্ড ইন্‌স্‌টিটিউশনেই সীমাবদ্ধ, তখন শিক্ষালাভ আর কত কি ঘটিয়াছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই চারিটা উপাধি, যখন তাঁহার নামের শেষে সংযোজিত হয় নাই, তখন তিনি শিক্ষিত সমাজে কিরূপে সমাদৃত হইবেন? কথাটা ঠিক। যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন করাই বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সূর্য্যকান্ত মুর্খ, শিক্ষিত সমাজে স্থান পাওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। আর যদি জ্ঞানোপার্জ্জনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে সূর্য্যকান্ত জ্ঞানী,—উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা, মাত্র তিন বৎসরের জন্য ওয়ার্ডইন্‌স্‌টিটিউশনে সীমাবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা ছিল,—জ্ঞান-সঞ্চয়ে লিপ্সা ছিল,—হৃদয়ে উদ্দীপনা ছিল; বড় মানুষ হইয়াও কঠোর সাধনায় তৎপর ছিলেন; তাই উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে তাঁহার হৃদয়-মন্দির আলোকিত,—বিদ্যালয়ের শিক্ষাভাবেও আজ সংসারের চোখে তিনি একজন জ্ঞানী।

"এই সংসারে যাবতীয় কার্য্যই সাধনার অধীন। আধ্যাত্মিক

জীবন হইতে কৃষি জীবন পর্য্যন্ত সকলই সাধনা-সাপেক্ষ। পৃথিবীতে যাহা হইয়াছে,—মানুষ যাহা করিয়াছে,—মনঃপ্রাণে সাধনা করিলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে”*—এই বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে অক্ষুণ্ণাবস্থায় বিরাজমান, তাহার জীবনে শিক্ষালাভ ঘটিবে না কেন?

তিনি জানিতেন, জগতে উন্নতিলাভ করিতে হইলে, প্রথমে শিক্ষার প্রয়োজন এবং শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক। শিক্ষালাভ না ঘটিলে কোন বিষয়েই তেমন অভিজ্ঞতা জন্মে না। অভিজ্ঞতাশূন্য মানব উন্নতি মার্গে বিচরণ করার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাই তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে একটা প্রবৃত্তি ছিল। প্রবৃত্তি শূন্য হৃদয়ে শিক্ষার আলোক প্রজ্বলিত হওয়া আকাশ-কুসুম সদৃশ।

ওয়ার্ডস্ ইন্‌স্‌টিটিউশন হইতে বহির্গত হইয়া যদিও তিনি অনতিবিলম্বেই বিষয়ের দুশ্ছেদ্য তন্তুজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন,—বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার তেমন কোনই সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না, তথাপি শিক্ষালাভে যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহার ইচ্ছা আছে,—যাহার প্রবৃত্তি জ্ঞানোপার্জ্জনে তৎপরা, তিনি কথনও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ বিষয়ের মোহান্ধকার, জ্ঞানের প্রদীপ্ত পন্থা অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে, বাসনার তৈল-সংশ্লিষ্ট হইলে জ্ঞানের প্রদীপ আপনা হইতেই জ্বলিতে থাকে। সুতরাং সূর্য্যকান্ত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইবেন কেন?

কার্য্য শিক্ষালাভের একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। অশিক্ষিত বিষয়ও কার্য্যের সহায়তায় শিক্ষা করা যাইতে পারে। মিঃ স্মাইলস্ কহিয়াছেন :—“Work is the best of all educators; for it forces men into contact with others, and with things as they really are.” জ্ঞান-পিপাসু সূর্য্যকান্ত, মহামতি স্মাইলসের

* শিকার-কাহিনী।

উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষার আশায় সাময়িক পত্রিকা পাঠ, সাহিত্য-সেবকগণের গ্রন্থালোচনা, প্রভৃতি কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া বাঙ্গালা, ইংরেজী উভয়বিধ ভাষাতেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

একাগ্রতা এবং অনুসন্ধানেচ্ছা, এই দুইটী মহদ্‌গুণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবল থাকিয়া তাহাকে অতি সহজে জ্ঞানের পথে লইয়া যাইতে পারিয়াছিল। একাগ্রতা না থাকিলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। জ্ঞান-পিপাসু সূর্য্যকান্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্তির জন্য ব্যগ্র না হইয়া তাহার প্রত্যেক শব্দার্থ, বাক্য-বিন্যাস, ভাব-সংযোগ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েরই অনুসন্ধান লইতেন। শব্দার্থ বুঝিতে না পারিলে তৎক্ষণাৎ অভিধান খুঁজিয়া তাহা শিক্ষা করিতেন; তাহাতে কোনরূপ বিরক্তি বা আলস্যজ্ঞান হইত না। স্থূল কথা, না বুঝিয়া, একটী হরপও পাঠ করিতেন না। "একটী শব্দ নাই বা বুঝিতে পারিলাম, ভাব বুঝিলেই হইল"—এইরূপ আলস্য-বিজড়িত নিশ্চেষ্টতার ভাব একদিনও তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই। শব্দার্থ খুঁজিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অভিধান দেখা সম্বন্ধে একদিন তাঁহার জনৈক বন্ধু কহিয়াছিলেনঃ—"এত ঘন ঘন অভিধান খুলিলে পুস্তক খানি ছয় মাসেও শেষ হইবে না।" "—নাই বা হ'ল—" অতি দৃঢ়তার সহিত তিনি উত্তর দিলেন,—"নাই বা হ'ল। অক্ষর চিনিয়া পাঠ করাই পুস্তক অধ্যয়নের উদ্দেশ্য নহে; উহা বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন।"

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি এইরূপে কঠোর পরিশ্রমে,—অমানুষিক সাধনার বলে জ্ঞানের প্রবল পিপাসার কথঞ্চিৎ শান্তি করিয়াছিলেন। "শিকার-কাহিনী" নামক গ্রন্থ খানি তাঁহার সেই অবিশ্রান্ত সাধনার ফল। শিকার কাহিনীর ভাষার পারিপাট্য,—ঘটনার সমাবেশ,—ভাবের

শিকার-কাহিনী।

বৈচিত্র দর্শনে কার না প্রাণ বিমোহিত হয়? মাতৃভাষায় এমন সুললিত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাষা-পরিস্ফোটক গ্রন্থ অতীব বিরল। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি পাঠ করিলে প্রাণে স্বতঃই শান্তির উদ্রেক হয়।* শিক্ষার উৎকর্ষতা লাভই কি ইহার মূল নহে? বনস্থলীর উদাস উন্মুক্ত শ্যাম-শোভন দৃশ্য দেখিয়া মনোগত ভাবের উৎস ঢালিতে গিয়া কি মধুর ভাষায় লিখিয়াছেন ঃ—

"গহন বিপিনে অই বিটপী-নিচয়,
স্থির-মূর্ত্তি উর্দ্ধ বাহু মহাযোগী প্রায়,
আছে দাঁড়াইয়া। তাহে লতা মাধবীর,
জড়াইয়া শ্যাম-শিরে জটার মতন;
নীরব নিষ্পন্দ, তারা ধ্যান নিমগন।
কোথাও নাহিক তথা জন-সমাগম,
শাখে পাখী, ফুলে ভৃঙ্গ দিতেছে ঝঙ্কার,
কোথাও কুরঙ্গ-শিশু, মুখে শার্দ্দূলের
বন-ভূমি কাঁপাইয়ে করিছে চীৎকার।
আমি তার মাঝে,—কেন জীব জগতের,
অগ্নিবাণ লয়ে করে, সংসার অনলে
উত্তাপিত হ'য়ে হায়! শান্তির আশায়
ভ্রমিয়ে বেড়াই বিধি! বুঝি না বিধান,
জানি না এ ব্রতে কিবা ঘটে পরিণাম!

* ৺মহারাজা সূর্য্যকান্তের শিক্ষার উৎকর্ষতা পরিস্ফোটক তৎপ্রণীত "শিকার কাহিনী" ও অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে ১৩১৫ সনের ১৫ই কার্ত্তিকের 'বঙ্গবাসীতে' লিখিত হইয়াছে,—" * * * তিনি "শিকার-কাহিনী" নামক মনোহর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি "নির্ম্মাল্য" নামক মাসিক-পত্র সম্পাদনে এবং নানা প্রবন্ধ ও সঙ্গীত রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। * * *"

বিষয়-কর্ম্ম-ক্লিষ্ট গুরুভারাক্রান্ত মানবজীবনে শিক্ষাবিষয়ে যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভবপর, তিনি তল্লাভে বিন্দুমাত্রও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। অনুসন্ধানেচ্ছা চিরকালই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ছিল। ইহার প্রভাবেই এত অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি! শিক্ষালাভ,—পঠন, দর্শন, কতক বা শ্রবণের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। কেবল কয়েক খানা পুস্তকের ভাষা মুখস্থ করিলেই ভাষাবিদ্ হওয়া যায় না।—কিম্বা গ্রন্থ-লিখিত বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই প্রাকৃতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়া উঠে না। রীতিমত অনুসন্ধান দ্বারা অন্তর্নিহিত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে তদ্বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়া থাকে।

এই অনুসন্ধানেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া মনস্বী সূর্য্যকান্তের জ্ঞান-পিপাসু-হৃদয় এত প্রবল বেগে উদ্বেলিত হইত যে, যেরূপ অনুসন্ধান কার্য্যে জীবন পর্য্যন্ত বিনাশের সম্ভাবনা বিদ্যমান, তেমন গুরুতর সঙ্কটাপন্ন বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। মধুপুরের নিবিড় অরণ্য মধ্যে খ্যাতনামা দস্যুসর্দ্দার রূপগীর সন্ন্যাসীর ভগ্ন বাটীর অনুসন্ধান ব্যাপারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্থল।

ব্রিটিশ সিংহের আগমনের অব্যবহিত পরে রূপগীর সন্ন্যাসী নামক জনৈক দস্যুসর্দ্দার ময়মন সিংহ জিলার অন্তঃপাতী মধুপুর প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে বিস্তর অত্যাচার করিত। তাহার অধীনে প্রায় পাঁচ সাত শত 'রামায়ৎ', সৈন্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তৎকালে দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবল পরাক্রম পরিস্ফুট হইয়াছিল। আলাপসিংহের জমিদারগণ তাহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তৎপ্রতিকার আশায় ১৭৮২ খৃঃ অব্দে রেভিনিউ বোর্ডে আবেদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে মিঃ হেনরী লজ্ সাহেবের চেষ্টায় উহা নিবারিত হইয়াছিল। * ইতিহাস

মিঃ হেনরী লজ,—সন্ন্যাসী দমন।

বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার রূপগীর সন্ন্যাসীর বাসস্থান—উহা কিরূপ ভাবে অবস্থিত, এই বাটীর ভগ্নাবশেষে প্রাচীন তত্ত্বের কোনরূপ বৈচিত্র্য আছে কি না, তৎসম্বন্ধে ইদানীন্তন অনেকেই অনভিজ্ঞ। যথার্থ তত্ত্বোদঘাটন অনেকেই করিতে পারেন নাই।

অনুসন্ধানপ্রিয় সূর্য্যকান্ত শিকার ব্যপদেশে মধুপুর গড়ে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক একদিন উক্ত সন্ন্যাসীর ভগ্ন বাটীর সম্মুখীন হইয়া প্রাচীন তত্ত্ব অবগত হওয়ার জন্য ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। বাটীর নিম্নতল অনুসন্ধান করিয়া দ্বিতলে উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর সমভিব্যাহারী লোকজনে নানারূপ ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক উঠিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-পিপাসু হৃদয় সে নিষেধ মানিল না, সম্যক্ তথ্যানুসন্ধানে মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পরিশেষে সাহসে নির্ভর করিয়া একটী ভগ্ন সোপান দ্বারা অতি কষ্টে দ্বিতলে উঠিয়া অনেক গুপ্ত রহস্য অবগত হইলেন। জনশ্রুতিতে এই বাটী সম্বন্ধে যে সমস্ত অদ্ভুত কথা শুনা যাইত, এইক্ষণ স্বচক্ষে তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দানুভব করিলেন। দ্বিতল হইতে ভগ্ন সোপান পথে অবতরণ করিতে সাহসী না হইয়া সঙ্গীয় হাতীর 'রুসা' স্তম্ভে বাঁধিয়া তদবলম্বনে অতিকষ্টে ক্ষত বিক্ষত শরীরে অবতরণ করিলেন। এইরূপ কষ্ট স্বীকার না করিলে এই প্রাচীন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিতেন কি? লোকমুখে নানা বর্ণ-ফলিত অলীক গল্পান্ধকারে আজীবন অন্ধ সাজিয়া থাকিতেন না কি? অনুসন্ধানেচ্ছার প্রাবল্য বশতঃই তিনি অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এবং উহা শিক্ষা বিষয়ে মানসিক উৎকর্ষতা সংসিদ্ধি লাভে বিস্তর সহায়তা করিয়াছিল।

রূপগীর সন্ন্যাসীর ভগ্ন অট্টালিকা

জীবনে তিনি নিজ শিক্ষা নিয়াই স্থির ভাবে বসিয়াছিলেন না। দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে শিক্ষার বিস্তার ঘটিতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। শিক্ষাই মানব জীবনের উন্নতি-সোপান,—তদ্ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত বা জাতিগত, কোনরূপ উন্নতিরই আশা নাই, এ কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, তেমন সুঁবিধা ও সুযোগ না ঘটিলে, তাঁহার ন্যায় স্বকীয় উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া কেবল সাধনার উপর নির্ভর করতঃ স্বীয় চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিতে সর্ব্ব সাধারণের জীবন্ত উদ্দীপনা-শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। শিক্ষার সমস্ত উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়া একত্রিত হইলে যদি কেহ তাহার চর্চ্চায় নিরত হয়;—নতুবা সংগ্রহ করিতে কাহারও সাধ যায় না। এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া কেবল নিজের শিক্ষা নিয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না,—শিক্ষা বিস্তার কার্য্যেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোথাও বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা,—কোথাও লাইব্রেরী স্থাপন—কোথাও অর্থ সাহায্য দ্বারা উৎসাহিত করিয়া শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ঢাকা কলেজে বৃত্তিদান

১৮৭২ খৃঃ অব্দে ঢাকা কলেজের ছাত্রবৃন্দকে ৪৮০ টাকার দুইটী বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিয়া শিক্ষা কার্য্যে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক শিক্ষার্থীদিগের মহদুপকার সংসাধন করিয়াছেন। বৃত্তির আশায় শিক্ষার অনেক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। *

* এ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য্যকান্ত বাবুর নিকট যে ৪৭৮৯ নং পত্র লিখিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল :—

কলিকাতায় 'কটন ইন্‌স্টিটিউশন' স্থাপন সময়ে আমাদের মহারাজা বাহাদুর আর্থিক এবং মানসিক উভয় রকমে প্রচুর সহায়তা করিয়াছিলেন। বলিতে কি এই স্কুল স্থাপনে তিনি মনপ্রাণে যত্ন না করিলে উহা স্থাপিত হইত কিনা সন্দেহ।

কটন ইনস্টিটিউশন
কলিকাতা ১৮৯১ খৃঃ অঃ

তাঁহার সহৃদয়তা ও বিদ্যোৎসাহ, এক স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতিনির্ব্বিশেষে প্রয়োজনানুসারে সর্ব্বত্রই সমান ভাবে পরিব্যাপ্ত হইত।

No. 4789.

From

The Director of Public Instruction.

To

Babu Surja Kanta Acharja Choudhuri
Zaminder of Mukta-gacha,
Dated, Fort Willim, the 31st, Dec. 1872.

Sir,

I have the honour to acknowledge the reciept of your letter of the 17th, instant announcing your liberal gift of Rs 480-for two Scholarships to be held in the Dacca College and beg to appear you my cordial thanks on behalf of the Education Department for the encouragement you have thereby given to the schools and students in East, Bengal.

I shall be obliged, if you will make the money you have diposited in the Dacca Bank payable to the order of the Principal of the Dacca College.

Your generous benifaction be brought to the notice of His Honour the Lieutenant Governor.

I have the honour to be
sir
your most obidient servant.
(sd) (inetial)
Director,

কেবল ভারত ভূমিতেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বহু সাগরাদি অতিক্রম করতঃ সুদূর লণ্ডন নগরীতেও তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ের যশোগাথা কীর্ত্তিত হইয়াছিল। তথাকার "ইম্পিরিয়েল ইনস্‌টিটিউট" স্থাপনের সময় মহারাজা সূর্য্যকান্ত ১৮৮৭খৃঃঅব্দে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহী না হইলে কে কবে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন? *

ইম্পিরিয়েল ইনসটিটিউট লণ্ডন।

ময়মন সিংহ জিলার অন্তর্গত জামলপুর মহকুমায় ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তার মানসে কয়েক জন মহাত্মা উৎসাহ-প্রণোদিত হইয়া বিদ্যোৎসাহী সবডিভিসনাল অফিসার মিঃ ডনো (Mr. Donough) সাহেবের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য "ডনো হাই স্কুল" স্থাপন করেন। কিছুদিন স্কুল চলিবার পর যখন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন একটি অট্টালিকার বিশেষ প্রয়োজন

ডনো হাইস্কুল জামালপুর

* ভারতবর্ষের রাজকীয় শিক্ষা সমিতির সেক্রেটারী কলিকাতা হইতে ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে নবেম্বর যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

Calcutta, the 26th, Nov, 1887.

Raja shaheb,

I am directed by His Excellency the Right Honourable the Earl of Duffrin, Viceroy & Governor General of India, to inform you that you have been nominated to be a member of the council of the Central Committee of the Imperial Institute in India of which His Excellency the Viceroy is the President.

2. I am to add that His Excellency has been pleased to recommend to Her Majesty's Secretary of state for India that your name should be enrolled on the Committee of Indian Section of the Imperial Institute.

(sd) (inetial)

Secretary, Central Committee of Imperial Institute in India.

বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু আর্থিক অনাটনে সে অভাব দূরীভূত হইল না! তদ্দৃষ্টে মহাত্মা সূর্য্যকান্ত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া স্কুলের অট্টালিকা নির্ম্মাণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার সে স্মৃতি অক্ষুণ্ণ।

নালদা ও খেরিয়া স্কুল খুলনা।

বিদ্যোৎসাহী সূর্য্যকান্তের বিপুল অর্থবলে খুলনা জিলার অন্তঃপাতী "নালদা এবং খেরিয়ার" স্কুল গৃহ ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়া তদ্দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

মুক্তা গাছা রিডিং ক্লাব।

শিক্ষিত লোকমাত্রেরই গ্রন্থপাঠে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে এবং গ্রন্থালোচনা তাহাদের জীবনে একটু শান্তিকণা। কেবল তাহাই নহে,—শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভও উহার মূলে সন্নিহিত আছে। যিনি যত গ্রন্থালোচনা করিবেন, তাঁহার শিক্ষা ও জ্ঞান বহ্নি-বিদগ্ধ কাঞ্চন-প্রভার ন্যায় তত পরিমার্জ্জিত এবং উজ্জ্বলীকৃত হইতে থাকিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সময় অর্থাভাবে অনেকের পক্ষেই সে উজ্জ্বল প্রতিভা লাভের পক্ষে বিস্তর বাধা জন্মিয়া থাকে। নিজ অর্থে ক্রয় করিয়া কয়জন লোকে কয়খানা পুস্তক পাঠ করিতে পারে? ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে, সম্ভবপর হইলেও সর্ব্ব সাধারণের তাহাতে কোনই ফলোদয় হয় না। মুক্তা-গাছা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসিগণ মধ্যে গ্রন্থালোচনার এই একটী গুরুতর অভাব উপলব্ধি করিয়া সাধারণের অভাব বিমোচনকারী মহাত্মা সূর্য্যকান্ত ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে ২৫০৲ টাকা ব্যয়ে একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া প্রায় ৮০০৲ টাকার নানাবিধ গ্রন্থ ক্রয় পূর্ব্বক "মুক্তা-গাছা রিডিং ক্লাবের" ভিত্তিস্থাপন করিলেন। স্থানীয় শিক্ষিত লোকের একটা গুরুতর অভাব দূরীভূত হইয়া গেল।

১৮৮৩-খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ সহরে একটী "টাউন হল" প্রস্তুতান্তে

লাইব্রেরীর সমাবেশ করিয়া সহরবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। *

কলিকাতা নগরীতে মূক ও বধির বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া দেশের একটী গুরুতর অভাব অপনোদিত হইয়াছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি বৃত্তিরও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যাহাদের অদৃষ্ট দোষে শ্রবণ এবং রসনেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অভাব তাহাদের ভাগ্যে আর বিদ্যার শান্তি সুখোজ্জ্বল প্রীতিপ্রদ আলোক রাশির উপভোগ

* 'ময়মনসিংহ টাউনহল' প্রস্তুত সম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ কল্ম্যান্ মেকান্‌লে সাহেব ঢাকার কমিশনার সাহেবের নিকটে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর যে ১৫১২ নং পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকটন করা গেল :—

MUNICIPAL DEPARTMENT,

Municipal.
No. 1512,

From Calman Macanlay Esq.
Secretary to the Government of Bengal.
To The Commissioner of the Dacca Division.
Calcutta, the 3rd December 1883.

Sir,

I am directed to acknowledge the receipet of your endorsement No. 525 Tdated the 30th October last, regarding the intention of Raja Surja Kanta Acharjee Chowdhuri of Muktagacha to build a Town Hall at Nasirabad in the district of Mymensingh. The Lieutenant Governor desires that you will be so good as to convey to the Rajah an acknowledgement of his liberality and public spirit.

2. I am at the same time to suggest that the disign and plan of the building may be submitted for the Lieutenant Governor's inspection.

I have &c. &c.
(Sd.) C. MACANLAY
Secretary to the Government of Bengal.

ঘটিয়া উঠিতনা; চির-অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্নাবস্থায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ থাকিতে হইত। কতিপয় সুশিক্ষিত মহাত্মার বুদ্ধি-কৌশলে তাহাদের অজ্ঞানান্ধকারাবৃত অদৃষ্টাকাশে শিক্ষার আলোক-রশ্মি প্রতিভাসিত হওয়ার উপায় উদ্ভাবিত হইল,—তাহাদের প্রাণে যেন শান্তি সরসীর সুস্নিগ্ধ-সলিল-স্রোত প্রবাহিত হইয়া সংসারাভিধান হইতে অসম্ভব কথাটার মূলোচ্ছেদ করিয়া দিল। এই বিদ্যালয় স্থাপন কার্য্যেও আমাদের শিক্ষাপ্রিয় সূর্য্যকান্ত তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। সংসার হইতে শিক্ষার সুখ-স্মৃতি যে পর্য্যন্ত অপনোদিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সূর্য্যকান্ত চিরস্মরণীয় !!

মূক ও বধির বিদ্যালয়

শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না পাইলে দেশের উন্নতি সাধন হয় না। অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে কোন দেশ বা জাতি, উন্নতি সোপানের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহারই মূলে শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা সন্নিহিত। একদিন আমাদের রত্নগর্ভা ভারতও এই উভয় রত্নে বিভূষিতা হইয়া গর্ব্বস্ফুরিত কটাক্ষ ঈক্ষণে অপরের প্রাণে প্রতিযোগিতার তাড়িত প্রবাহ ঢালিয়া দিত। মধ্যযুগে সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া বিস্মৃতির গভীর গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়াছিল। সেই গুপ্ত রত্ন উদ্ধার মানসে কতিপয় স্বদেশ-বৎসল বিদ্যোৎসাহী মহাত্মার প্রযত্নে একটী সমিতি গঠিত হইয়া ভারতের শিক্ষার্থিগণকে আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, ইটালী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতঃ শিল্পাদির আলোচনা বর্দ্ধিত করা হইতেছে। এই সমিতি গঠন সময়ে সূর্য্যকান্ত প্রাণপণে সহায়তা করিয়াছেন,—যাহাতে উহার কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। এই সমিতিতে বার্ষিক ১২০০৲ টাকা সাহায্য দিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

শিল্প ও বিজ্ঞান চর্চ্চা

সূর্য্যকান্ত ইহাতেই প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন না,—জ্ঞান বিস্তারে তাঁহার অপরিসীম পিপাসা; মাত্র এই সমিতি অবলম্বন করিয়াই পিপাসার শান্তি হইল না। তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া টাঙ্গাইলের অন্তর্গত মামুদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তীকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ-সাহায্য প্রদানে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রেরণ করিলেন। শ্রীযুক্ত শশী কান্ত হেসকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইটালিতে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র বসুকে শিল্প শিক্ষার জন্য জাপান ও ইংলণ্ডে পাঠাইয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র দাসকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দেশে শিল্প ও বিজ্ঞানালোচনার উৎকর্ষতা সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু লোকে একমাত্র তাঁহারই অর্থ-সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী

শশী কান্ত হেস

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসু

গিরীশ চন্দ্র দাস

মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয় স্বদেশ-বাসিগণকে উচ্চ শিক্ষায় বিভূষিত করার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহে একটী কলেজ স্থাপন পূর্ব্বক যে, অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার অংশ বিশেষে লাইব্রেরীর অভাব দূরীকরণে মহারাজা সূর্য্যকান্তের পবিত্র স্মৃতিও অক্ষুণ্ন। এই লাইব্রেরীর পুস্তক সংগ্রহের জন্য তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১৫০০ টাকা দান করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহে কলেজ

প্রতি বৎসর ৺শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-বিদায়, তাঁহার একটী প্রধান কীর্ত্তি। ইহার মূলে সৎপাত্রে দান ও শিক্ষার উৎকর্ষতা সাধনে উৎসাহ প্রদান, উভয় উদ্দেশ্যই সন্নিহিত। দান-

গ্রহীতাগণ মধ্যে যিনি শাস্ত্রবিচারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন, তাঁহার ভাগ্যে দানের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে স্থানে প্রতিযোগিতা আছে সেই স্থানে উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। এই কার্য্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা,—শাস্ত্রালোচনা, অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার পরবর্ত্তী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একমাস কাল এই বিদায় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময়ে নানা দিগ্দেশ হইতে অগণিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া দান (বিদায়) গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই এক মাস পরে কৃষ্ণ পক্ষ মধ্যে কেহ উপস্থিত হইলে তিনি 'অর্দ্ধ বিদায়' পাইয়া থাকেন। এই বিদায়ের সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবারিত দ্বার; যত জনই উপস্থিত হউন না কেন, প্রত্যেকে বিদায়ের দান প্রাপ্ত হইবেন,—তাহাতে কেহই নিষেধ করিবে না। এই কার্য্যে বহুতর অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়

শিক্ষাপ্রিয় সূর্য্যকান্ত শিক্ষিত লোকের যথোচিত সমাদর করিতেন। নিজেও শৈশবের কোমল ক্রোড় হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শিক্ষার সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধিলাভও যে একেবারে না ঘটিয়াছে, তাহা নহে। তাঁহার ষ্টেটের কার্য্য পরিচালনে নিয়োজিত লোক মধ্যে শিক্ষিত লোকের অভাব নাই। তাঁহার জীবনের সমস্ত কার্য্যকলাপাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শিক্ষা বিষয়ে একজন গুপ্ত-সাধক ছিলেন;—এই গুপ্ত সাধনাই তাঁহার সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

অষ্টম সর্গ।

কার্য্যক্ষেত্রে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কোর্ট অব্ ওয়ার্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া সূর্য্যকান্ত বাবু ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় আলাপ সিংহ পরগণার চারি আনা, শেলবর্ষ পরগণার চারি আনা, এবং পুখরিয়া পরগণার সামান্য কিছু তাঁহার জমিদারী-ভুক্ত ছিল।

রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণের পর কিয়দ্দিবস বিলাসিতার অন্ধ মোহাবেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে যখন স্বীয় ভ্রান্তির বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন, তখন সেই আশু সুখকর পাপের পিচ্ছিল পথে আর অধিকদুর অগ্রসর না হইয়া পুরুষোচিত তেজঃ সহকারে কর্ত্তব্য পথে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কর্ম্মের সাধনা আরম্ভ করিলেন। যদিও তখন তাঁহার বয়স নিতান্ত অল্প ছিল,—মাত্র কৈশোরের সুকোমল ভাব-লহরী, অতীতের গর্ভে লুক্কায়িত থাকিয়া ধীরে ধীরে যৌবনের প্রবল তরঙ্গে মিশিতে ছিল;—যদিও সংসারের কুটিলতার ছায়া তখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই,—কেবল সরলতার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে যে দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সেই দিকেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে ছিলেন;—তথাপি তাঁহার হৃদয় ছিল,—হৃদয়ে সাহস ছিল,—পুরুষকারের বিন্দুমাত্রও অভাব ছিল না। তাই জ্ঞানের প্রদীপ্তালোকে অতি সহজে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়া লইলেন এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ দেওয়ানজীর সদুপদেশ-রূপ সুমন্দ-মারুত-প্রবাহে হৃদয়ের উচ্ছৃঙ্খল ভাব-নিচয় দূর করিয়া দিয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রের দ্বারদেশে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভগবান তাঁহাকে কর্ম্মের জন্য পাঠাইয়াছেন এবং কর্ম্মই তাঁহাকে দরিদ্রের পর্ণকুটীর-সংলগ্ন সীমাবদ্ধ সামান্য ক্ষেত্র

হইতে এই অসীম সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে আনিয়াছে !! তাই তিনি একাগ্র চিত্তে কর্ম্মের সাধনা আরম্ভ করিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই কঠোর সাধনায় তৎপর ছিলেন,—একদিনের জন্যও কর্ত্তব্য পথ-বিচ্যুত হন নাই।

হায়, বিলাসিতা, তোমার নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে, তুমি এমন সৌভাগ্যবান্ নব যুবককে হাতে পাইয়াও রাখিতে পারিলে না,—তোমার সেই সম্মোহনকারী বিলোল কটাক্ষ ক্ষেপণেও এই স্থিরপ্রতিজ্ঞ যুবকের ফুল্ল-সরস-প্রাণে আশু সুখকর প্রেমের উৎস ঢালিয়া দিতে পারিলে না;—এত চেষ্টা করিয়াও তোমার এই পীযূষ-প্রতিফলিত গুপ্ত-গরল রাশি তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিন্দু বিন্দু সিঞ্চন করিয়া মোহাবেশে অবশ তনু আরও অবশ করিতে পারিলে না;—অলীক প্রীতির রঙ্গ ভঙ্গে কর্ম্মের পথে ভঙ্গ দিতে পারিলে না! তোমার পক্ষে এ আক্ষেপ রাখিবার আর স্থান নাই। এখানে জ্ঞানের প্রদীপ অহর্নিশ প্রজ্বলিত;—কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের টানে প্রাণ মুহুর্মুহু আকর্ষিত —এখানে তোমার ঐন্দ্রজালিকী ভড়ং ভাড়ং কিছুই খাটিবে না। যেখানে কর্ত্তব্যে অনাদর,—কর্ম্মে শিথিলতা,—কেবল আত্মসুখই যেখানে জ্ঞান-বিচার্য্য-ফল, সেই খানে যাও,—সেখানে তোমার যত্ন হইবে। তোমার বিলোল কটাক্ষ,—মৃদু মন্দ হাসির ছটা,—সোহাগ-ক্ষরিত মধুর ভাব-বিভঙ্গিমাবলোকনে তাহারা অনায়াসে কর্ত্তব্যের মস্তকে সগর্ব্বে ভীম পদাঘাত করিয়া তোমার ঐ প্রীতি-প্রফুল্ল আবেশময় ভাব-স্রোতে কর্ত্তব্যহীন অবশ অঙ্গ নিঝুমে ভাসাইয়া দিবে,—জীবনের উপাস্য দেবতা জ্ঞানে একমাত্র তোমার চরণে মস্তক রাখিয়া মানব জীবনের কঠোর সাধনা সংসাধিত করিয়া লইবে; ভ্রমেও একবার মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের উজ্জ্বল কান্তি অবলোকন করিবে না। যাও, তুমি অনায়াসে সেই সব মাংসপিণ্ড লইয়া ক্রীড়া-কন্দুক প্রস্তুত

করতঃ নিজের আধিপত্য বিস্তার করগে,—সজীব কর্ম্মবীরের কোপাগ্নিতে পড়িয়া অনর্থক কুসুমায়ুধের ন্যায় সমূলে উৎপাটিত হইও না।

যাহা হউক, যুবক সূর্য্যকান্ত, বিলাসিতা-বিমণ্ডিত ইয়ার-সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু প্রশস্ত-পন্থা-নির্ব্বাচনে তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না;—একটু চিন্তান্বিত হইলেন। এই সময় যেন ঈশ্বরাশীর্ব্বাদেই সাক্ষাৎ কর্ম্ম আসিয়া হস্ত প্রসারণে তাঁহাকে লইয়া চলিল;—কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বার অতি সহজে প্রশস্ত হইয়া গেল।

এই সময়, মিঃ ডম্বল সাহেবের তত্ত্বাবধানে মনতলার নিকটবর্ত্তী সুতিয়া নদীর পোল প্রস্তুত হইতেছিল। ইহাও তাঁহারই কীর্ত্তি।

মিঃ ডম্বল সাহেব

ডম্বল সাহেব মনতলায় আসিয়া কেম্প করিলেন। আমাদের সূর্য্যকান্তের সহিত তাঁহার বেশ আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। গুণগ্রাহী সূর্য্যকান্ত বুঝিলেন, মিঃ ডম্বল সাহেবের দেহ মন কেবল কর্ম্মে গঠিত,—কর্ম্ম ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই নাই। তিনি প্রতিদিন মুক্তাগাছা হইতে মনতলা যাইয়া মিঃ ডম্বল সাহেবের সঙ্গলাভ করিতে লাগিলেন। মনতলা, মুক্তাগাছা হইতে চারি মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

দীর্ঘকাল ডম্বল সাহেবের সংসর্গে থাকিয়া, সূর্য্যকান্ত একটু সাহেব-ঘেঁসা হইয়া পড়িলেন,—তাঁহার চাল চলনও অনেকটা সাহেবী ধরণের হইয়া পড়িল। বাস্তবিক, ইংরেজ-চরিত্র যে ভাবেই গঠিত হউক না কেন, তাহাদের কার্য্য-তৎপরতা সর্ব্বথা অনুকরণযোগ্য। তাহারা সময়ের মূল্য বুঝে,—কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিশেষ রূপেই অবগত আছে,—কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহাদের জীবন গঠিত। মিঃ ডম্বল সাহেব অতি বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মে তৎপর ছিলেন; তাঁহার অবিশ্রান্ত কার্য্য-তৎপরতা দর্শনে ও সুমধুর উপদেশ শ্রবণে, সূর্য্যকান্ত এতই বিমোহিত হইয়াছিলেন যে,

উত্তর কালে তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ সাহেবী ধরণে গঠিত করিয়া ছিলেন। এই সংসর্গ হইতেই জনসমাজে তাঁহার নামে একটু কলঙ্ক কালিমা স্পর্শ করিল;—নিতান্ত 'সাহেব-ঘেঁসা' বলিয়া সর্ব্ব সাধারণে যেন একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিতে লাগিল।

'সাহেব ঘেঁসা', দুর্নাম বটে; কিন্তু এই সংসর্গ হইতে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের যে সুন্দর পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, নিজের জীবন কর্ম্মময় করিয়া জগতে কর্ম্মবীর সাজিবার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল পাইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইংরেজ জাতি যেমন কর্ম্মে তৎপর, অন্যে তেমন নহে; কর্ম্ম-জগতে তাহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সূর্য্যকান্ত গুণগ্রাহী,—তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াই মিঃ ডম্বল সাহেবের সহিত মিশিয়া পড়িলেন। তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া কিরূপে কর্ম্মের সাধনা করিতে হয়,—অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করতঃ সমস্ত দিন কিরূপে কার্য্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে হয়, তাহা তিনি বিশেষরূপে অভ্যাস করিলেন। মিঃ ডম্বল সাহেবই, তাঁহার ইংরেজী শিক্ষায় স্পৃহা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং কর্ম্মে তৎপরতার শিক্ষা-গুরু। বলিতে কি, ইয়ার-সঙ্গ যেমন তাঁহাকে জীবনের সারবত্তা বুঝাইয়া দিয়াছিল,—তেমন এই সাহেব-সঙ্গই তাঁহাকে কর্ম্মের পথে টানিয়া লইয়া সোপানসজ্জিত কর্ম্মের স্তর দেখাইয়া দিয়াছে। তাই তিনি যৌবনে এত সাহেব প্রিয় ছিলেন। সাহেব-সঙ্গ সাধারণের চোখে দোষের হইলেও সূর্য্যকান্তের জীবনে বিশেষ কার্য্যকারিতা দেখাইয়াছে।

যাহা হউক, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক সূর্য্যকান্ত, জীবনের উদ্দেশ্য বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে,—প্রজার অবস্থা কিরূপ,—কার্য্যপ্রণালী সুন্দররূপে চলিয়াছে কি না,

ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি অল্পদিন মধ্যেই আয়ত্তাধীন করিয়া বিপুল-পরিশ্রম-সহকারে ক্রমে ক্রমে জমিদারী কার্য্যের প্রতি পরমাণুতে নিজের আত্মা মিশাইয়া দিলেন। কার্য্য ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কিছুই রহিল না। দৈনন্দিন আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়া ন্যায়ান্যায় বিবেচনাপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে অযথা ব্যয়গুলি বহুলাংশে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে আয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া চলিল।

মিঃ কেলানুজ।

এই সময় মিঃ কেলানুজ সাহেবের সহিত, সূর্য্যকান্ত বাবুর বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিয়া গেল। কিছুদিন মধ্যেই যেন উভয়ে একবৃন্তে দু'টী কুসুম-সদৃশ হইয়া উঠিলেন। কেলানুজ-সংসর্গে থাকিয়া সূর্য্যকান্ত বিশেষ কার্য্যতৎপর হইয়া উঠিলেন,— রাজকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ প্রকাশ করিলেন। মিঃ কেলানুজ সাহেব অতি বিচক্ষণ ও সুচতুর লোক ছিলেন। ইনি সময় সময় রাজকার্য্যের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন বটে, কিন্তু সুচতুর সূর্য্যকান্ত বড় একটা ঘেঁসিতে দিতেন না, সর্ব্বদাই দুরে দুরে রক্ষা করিতেন। অপরের পরামর্শ মত রাজকার্য্য করা, কিম্বা অপরের হাতে ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া অবস্থান করা, সূর্য্যকান্ত বাল্যকাল হইতেই ঘৃণা করিতেন। তিনি এক দিনের জন্যও 'পরের মুখে ঝাল খাইয়া' ঝাল উপলব্ধি করেন নাই। ইহাও সাহেব-সঙ্গের একটী গুণ-বিশেষ।

একদিনও তিনি রাজকার্য্য ভুলিয়া অলসে বসিয়া থাকিতেন না। তিনি সময়ের মূল্য বুঝিতেন,—সময়ের কার্য্য সময়ে না করিলে যে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, এ কথা বেশ জানিতেন। জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে,—"In youth the hours are golden, in mature years they are silvern, in old age they are leaden. Who at twenty knows nothing,

at thirty does nothiog, at forty has nothing". * জানিয়া শুনিয়াই আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া বিপুল পরিশ্রম সহকারে ইষ্টেটের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই কার্য্য-প্রণালীর জ্ঞাতব্য-বিষয় গুলি আয়ত্তাধীন করিয়া লইলেন। সুতরাং সহজে কেহ তাঁহার চোখে ভ্রমাত্মক ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বার্থ সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া লইতে সাহসী হইত না। এই সময় তিনি ধীর পাদবিক্ষেপে সংসারের কূটনীতির সূক্ষ্ম তত্ত্ব-চ্ছিদ্রে অতি সতর্কতার সহিত প্রবেশ করিয়া রাজনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন।

কৈশোরের প্রীতি-প্রফুল্ল সুকুমার বৃত্তিগুলির পরিস্ফোটন সময় হইতেই তাঁহার একগুঁয়েমি ভাব পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। যখন যে কার্য্যে মতি অগ্রসর হইত, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করিয়া কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। কার্য্যের শুভাশুভ, কার্য্য গ্রহণের সময়েই বিবেচনা করিতেন, গ্রহণান্তে আর সে দিকে লক্ষ্য থাকিত না। ফল যেমনই হউক না কেন, তাহার শেষ সীমা অবলোকন করাই চাই।

"সম্পত্তি-ধ্বংসের জন্যই পোষ্য পুত্রের সৃষ্টি"—এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্যের বিদ্রূপাত্মক ভাব-লহরী তাঁহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে এমন কি, হৃদয়ের অতি নিভৃত কক্ষস্থিত অনুধাবনা শক্তির প্রতি পরমাণুতে চঞ্চল-চপলা-বিকাশের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ স্থির-চিত্তে উদ্দীপনার মৃদু মন্দ মরুৎ-সঞ্চালনে উৎসাহের তরঙ্গ তুলিয়া দিত। সেই উৎসাহ হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্তি,—প্রবৃত্তির বশেই কার্য্যের সংস্থান এবং তাহারই পরিণাম ফলে পূর্ব্বোক্ত ধারণার অলীকত্ব বুঝাইয়া জীবনে অপরিসীম উন্নতি,—

* Mr smiles life and labour.

সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন। ওহো, সাধনার এমন সুন্দর দৃশ্য আর কোথায় আছে !!

ভূম্যধিকারীর সহিত প্রজার এবং প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুনিয়মে প্রজা পালন,—প্রজাকে নিরাপদে রাখা,—তাহাদের উন্নতির জন্য সর্ব্বথা চেষ্টা করা যে, ভূম্যধিকারীর একান্ত কর্ত্তব্য; অযথা প্রজা-পীড়নে পাপ, প্রজার আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে যে, কোন কার্য্যই সংসিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা তাঁহার চিন্তাশীল হৃদয়ে পূর্ব্বাহ্ণেই স্থান পাইয়াছিল, এবং কর্ত্তব্য পরায়ণতার সহিত ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করাই যে, ঐ সমস্ত নিয়ম প্রতিপালনের এক মাত্র উপায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন,—"জমিদারগণের প্রজার প্রতি সর্ব্বদা সদয় ও সরল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা নিতান্ত অসভ্য ও অমানুষোচিত কার্য্য। জমিদারগণ কেবল কর্ম্মচারিগণের উপর কার্য্যভার না দিয়া স্বয়ং কার্য্য দেখিলে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে অসদ্ভাবের সৃষ্টি হইতে পারে না। জমিদারের কর্ম্মচারিগণ প্রজার প্রতি অন্যায় আচরণ করে; সময়ে সময়ে উৎপীড়ন করিয়া অধিক অর্থ আদায় করে। যাহাতে কর্ম্মচারিগণ দ্বারা প্রজা উৎপীড়িত না হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা মনোযোগী থাকা উচিত। কোন প্রজা কার্য্যকারক দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া জমিদার সমীপে তৎপ্রতিকার-প্রার্থী হইলে অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করা শ্রেয়ঃ। প্রজার প্রতিকার প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত না করিয়া জমিদার স্বয়ং তাহা শ্রবণ করিলে প্রজার প্রতি অত্যাচার অনেক নিবারিত হয়। প্রজার দুঃখ শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনা ও উপযুক্ত প্রতি-বিধান করিলে তাহার মনঃক্ষোভ নিবারিত হয়। শস্যাদির মূল্য কমিয়া গেলে, কি দুর্ব্বৎসরের গতিকে প্রজা খাজানা দিতে অপারগ হইলে

তাহাদিগের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করা জমিদারের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কোন সময় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রজার খাজানা মাপ দিয়া অধিকন্তু তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য দ্বারা উপকৃত করা বিধেয়। কিরূপে ভূমির উৎকর্ষতা সাধিত হইয়া কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে তৎপ্রতি ভূম্যধিকারীর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রজাকে অসহনীয় কর ভারে প্রপীড়িত করা উচিত নহে। প্রজাদের মধ্যে যে যেমন সম্মানের ব্যক্তি তাহাকে সেইরূপে সম্মানিত করা কর্ত্তব্য। কাহারও কুলধর্ম্মের বিপরীতাচরণ করিয়া মনঃকষ্ট দেওয়া নিতান্ত অন্যায়।"*

এই সমস্ত কর্ত্তব্যাবধারণের ভাব-লহরী, যে মুহূর্ত্তে তাহার চিন্তাশীল হৃদয়ের প্রতি স্তর উদ্বেলিত করিয়া কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি কিরূপে অতি ধীর পদ-সঞ্চালনে তাহা সুবাসিত বিকচ-কুসুম-গ্রথিত মাল্য-রচনার ন্যায় প্রভূত নৈপুণ্য সহকারে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পরিস্ফোটন দ্বারা জন-সাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক্ চিত্রগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া পাঠক পাঠিকার আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির বাসনা রহিল। এখানে কেবল তাহার কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভের বিবৃতি বিষয়ে চেষ্টিত হইলাম।

সুনিয়মে প্রজা পালন, ভূম্যধিকারীর একটী প্রধান কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য-সাধন করিতে গেলেই প্রজার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ স্থাপন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রভূত ধীরতার সহিত মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সমাগত প্রজার প্রার্থনা শ্রবণ,—ন্যায়ান্যায়ের বিচার,—তাহাদের আপত্তি-ভঞ্জন,—সহজে বিবাদের মীমাংসা দ্বারা তাহাদের অর্থ সঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া প্রভৃতি রাজোচিত কর্ত্তব্য-সাধনে, প্রজার মন

* ৺মহারাজা বাহাদুর প্রণীত—"জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর" ভূমিকা।

সহজেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। "আমি রাজা,—প্রজার আরাধ্য দেবতা; সুতরাং তাহাদের সহিত বাক্যালাপে আমার মর্য্যাদার হানি হইবে,—অথবা তাহাদের অযথা বাক্‌বিতণ্ডায় আমার সুখময় জীবনের শান্তিভঙ্গ হইবে"—এরূপ অহং রাগে রঞ্জিত হইয়া মাৎসর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি সাজিয়া গর্ব্বস্ফুরিত গম্ভীরাননে বসিয়া থাকিলে, প্রবলের মুখাপেক্ষী দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের অকপট হৃদয়ের ভক্তি-সিঞ্চিত প্রীতি-কুসুমে অর্চ্চিত হওয়া আকাশ-কুসুম অথবা শশ-বিষাণ সদৃশ। মনস্বী সূর্য্যকান্ত জীবনে কখনও তেমন বিসদৃশ ভাবের অবতারণা করেন নাই। তিনি প্রতি-নিয়ত অন্যান্য দৈনন্দিন কার্য্যের সহিত সমাগত প্রজামণ্ডলীর আপত্তি শ্রবণাদিও কর্ত্তব্য জ্ঞানে তচ্ছ্রবণে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক হইতে শত শত অভাব অভিযোগ,—শত সহস্র দুঃখ-কাহিনী তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপিত হইতেছে, আর তিনি তাহাদের প্রত্যেকটি কথা অম্লান বদনে অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া যথাযথ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। কিছুমাত্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই; কিম্বা এরূপ অযত্ন-ভাষিত বাক্য-শ্রবণে তাঁহার পীযূষ-পূরিত-সুকণ্ঠ-শ্রবণাভ্যস্ত শ্রবণ-বিবরে জীমূত-মন্দ্র-সদৃশ কর্কশ-নিনাদ বলিয়া ঘোরতর অশান্তি-উৎপাদন করিতেছে, ভ্রমেও তাহা মনে করেন নাই। তিনি বুঝিতেন, প্রজাগণ মনের দ্বিধা ভঞ্জনের জন্যই ভূম্যধিকারীর নিকট গমন করে; তিনি তাহাতে বিরক্তিপ্রকাশ করিলে তাহারা আর কার নিকট যাইবে? কে তাহাদের হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তাহাদের দুঃখ-কর্দ্দমে স্বীয় গাত্র অপবিত্র করিবে? অসময়ে তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায়, নিজের দুঃখ-কাহিনী বিবৃতিতে অনুকূল ফললাভ হউক বা নাই হউক, মনিব তাহার কান্না শুনিয়াছেন,—নিজের দুঃখ-কাহিনী মনিবের নিকট কহিয়া মনের বেদনা লাঘব করিতে

পারিয়াছে, ইহাতেই প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইয়া দুঃখ-বিক্ষোভিত-প্রাণে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং বিনা অর্থ ব্যয়ে যদি একটু শ্রবণ-সংযোগ দ্বারা এরূপ একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তবে তেমন সৎকার্য্যে কৃপণতা কে করে?

প্রজার অভাব অভিযোগ শ্রবণ মাত্রেই প্রজারঞ্জক সূর্য্যকান্ত, শত কার্য্য উপেক্ষা করিয়াও তাহার প্রতিকারের উপায় করিয়া দিতেন এবং উপযুক্তরূপে প্রতিকার হইল কি না, বিশেষরূপে তাহার অনুসন্ধান লইতেন। প্রজা নিয়াই রাজ্য; সুতরাং সেই প্রজার কার্য্য এরূপ আগ্রহের সহিত সম্পন্ন না হইলে রাজ্য রক্ষা হইবে কিরূপে? সুরম্য-হর্ম্ম্য-তলে দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যায় গর্ব্বাস্ফুরিত দেহভার লইয়া উপবিষ্ট থাকিলেই রাজ্যরক্ষা হয় না,—ইহা তিনি সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিলেন।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে দিল্লি নগরীতে এক বিরাট দরবার হয়। ভারতের সমস্ত রাজন্যবৃন্দ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় লর্ড লিটন বাহাদুর ভারতের গবর্ণর জেনেরেল ছিলেন। এই দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের "সাম্রাজ্ঞী" বলিয়া ঘোষিত হন। দরবার উপলক্ষে অনেক কারারুদ্ধ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়াছিল। উপযুক্ত ব্যক্তি-নির্ব্বাচনে নানাবিধ সম্মান-সূচক উপাধি দ্বারা অনেককে ভূষিত করা হইয়াছিল। আমাদের সূর্য্যকান্ত, প্রজারঞ্জকতাদি রাজোচিত গুণগ্রামে বহুপূর্ব্ব হইতেই গবর্ণমেণ্টের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ১লা জানুয়ারী তারিখে মহামান্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর অতি আনন্দের সহিত উন্নতমনা সূর্য্যকান্তকে "রায় বাহাদুর" উপাধি-ভূষণে বিভূষিত করিলেন। সে সম্মান লাভে স্থিরহৃদয় কর্ম্মী সূর্য্যকান্তের কর্ম্ম-তৎপর প্রাণে উৎসাহের প্রবল তাড়িত-প্রবাহ ছুটিয়া ছুটিয়া তাঁহাকে

দিল্লির দরবার।

রায় বাহাদুর উপাধি লাভ।

আরও ক্ষিপ্রতা সহকারে কর্ম্মের পথে টানিয়া লইল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

প্রজাকে নিরাপদে রক্ষা করা ভূম্যধিকারীর আর একটী কর্ত্তব্য! প্রজা 'কর' দিয়া রাজ্যে বাস করে সত্য, কিন্তু তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাজার হস্তেই ন্যস্ত। আপদে বিপদে তিনিই তাহাকে রক্ষা করিবেন। সে বিষয়ে উদাসীন হইলে, গরীব প্রজাগণ কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? কে তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে? আশ্রয় দাতা সূর্য্যকান্তের কর্ণকুহরে বিপন্ন প্রজার করুণ আর্ত্তনাদ স্থান পাইত, তিনি প্রাণপণে প্রজাগণকে অন্যের করাল-কবল হইতে রক্ষা করিতেন। প্রজাগণ তেমন গুরুতর বিপদেও 'দোহাই মহারাজার' বলিয়া নিশ্চিন্ত হইত এবং মহদাশ্রয়ে উপযুক্ত প্রতিকার লাভে নিঃশঙ্ক-চিত্তে বাস করিয়া আনন্দিত হইত।

প্রজাগণ দেহের শোণিতরাশি সলিলে পরিণত করিয়া বিপুল পরিশ্রমে শস্যোৎপাদন করে এবং তদ্দ্বারাই আহারাদির সংস্থান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। যদি সেই সমস্ত পরিশ্রমলব্ধ সামগ্রী দস্যুকরে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা হইলে তাহার যে কি মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। দুষ্ট-দমনকারী সূর্য্যকান্ত বিশেষ কঠোরতার সহিত বহুলাংশে সে উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিক্রম প্রকাশের ভীষণ কাহিনী, এখনও লোকে ভীতির চোখে দেখিয়া থাকে,—সে তেজঃপ্রভায় এখনও তাঁহার নামে দুষ্ট হৃদয় বিকম্পিত হইয়া উঠে। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও প্রশংসার সহিত মানবকণ্ঠে নিনাদিত,—সে কাহিনী যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

রোগের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য স্থানে স্থানে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন,—দুর্ভিক্ষে অন্নদান প্রভৃতি বহুবিধ মহদুপায়ে তিনি প্রজাগণের রক্ষা সাধন করিয়াছেন।

শিকার বাসনা তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত প্রবল ছিল। নিজেও একজন

শ্রেষ্ঠ শিকারী ছিলেন। এই বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য অনেকগুলি হস্তী তাঁহার পোষ্যরূপে প্রতিপালিত। তিনি দেখিলেন, হস্তী-রক্ষক মাহুতগণ যেমন দুর্ব্বৃত্ত এবং হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য, তাহাতে তাহাদের দুর্ব্বৃত্ততা-বলে নিরীহ প্রজা-পুঞ্জের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। প্রজাগণ দু'টী পয়সা উপার্জ্জনের জন্য কদলীবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে; অনেক স্থলে দেখা যায়, মাহুতগণের অত্যাচারে তাহাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। অধিকন্তু স্থল বিশেষে এই সামান্য বিষয় নিয়া কলহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ক্রমে প্রজা-ভূম্যধিকারী মধ্যে বিষম মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। নিঃস্ব প্রজাগণ অযথা উৎপীড়িত হইয়া লাঞ্ছিত হয়। নিজের একটা সামান্য ব্যসনের তৃপ্তিসাধন জন্য নিরপরাধ প্রজার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করা বিবেচকের কর্ত্তব্য নহে বিবেচনায় যাহাতে তাহার দন্তি যূথ হইতে ঐরূপ একটা "কেলেঙ্কারীর" সৃষ্টি না হয়, তন্নিবারণার্থ তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয়ে স্থানে স্থানে কদলী বনের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। আবশ্যক মত তথা হইতেই দন্তি-যূথের খাদ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রজার সর্ব্বনাশ সাধিত না হইয়া বরং রক্ষার এক সুমহান্ পন্থা আবিষ্কৃত হইল। তাহার এই শিকার-ব্যসনে প্রজাগণ হিংস্রক জন্তুর যথেচ্ছা আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছে।

শস্য কেবল যে, প্রজারই যত্নের ধন,—ভূম্যধিকারীর কিছুই নহে, একথা তিনি স্বীকার করিতেন না। ভূম্যধিকারিগণও ঐ শস্যের সার ভাগ দ্বারা প্রতিপালিত। সুতরাং উহা নষ্ট হইলে সকলেরই ক্ষতি, ইহা তিনি সর্ব্বদা মনে রাখিতেন।

একদা শিকার-ব্যপদেশে বনে বনে পরিভ্রমণ উপলক্ষে এক বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া রাশীকৃত দন্তি-যূথ-সহকারে যাইতে ছিলেন। ক্ষেত্রাধিপতি কৃষক মনে ভাবিল, হস্তীগুলি নিশ্চয় তাহার ক্ষেত্র মধ্য দিয়া চালিত হইবে এবং তাহাতে তাহার জীবনোপায়ের প্রধান সম্বল শস্যগুলি

"সমূলেন বিনশ্যতি" হইবে। অনেক গর্ব্বিত শিকারী দ্বারা সে আরও অনেকবার এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; তাই সে অতি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে সন্ত্রাসিত চিত্তে মহারাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়া যাহাতে ক্ষেত্রটী নষ্ট না হয়, তন্নিবারণের প্রার্থনা করিল। প্রজা-রঞ্জক সূর্য্যকান্ত শস্য নষ্টের কোনরূপ আশঙ্কা নাই বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"হায়, অজ্ঞ কৃষক! তুমি জান না, কি বুঝ না যে, আমি রাজাই হই, আর মহারাজাই হই, আর যাই হই, আমিও মানুষ; এক ক্ষেত্র হইতেই ভগবান্ তোমার এবং আমার খাদ্য উৎপন্ন করিয়া দিতেছেন।" * মহতের কি মহতী চিন্তা!! সহৃদয়তার কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত,—প্রজাবাৎসল্যের কি জ্বলন্ত ছবি!!! এরূপ অনেক মদ-গর্ব্বিত আছেন, যাহারা ঐ শস্য নষ্টে বরং আমোদই উপভোগ করিতেন,—কিম্বা আপন দন্তি-যূথের উদর-পূর্ত্তির সংস্থান করিয়া লইতেন।

রাজা মাত্রেরই রাজনীতিজ্ঞ হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সময়োচিত রাজ-নীতির কূট-মন্ত্রণা-জালের সূক্ষ্ম তন্তুতে প্রবেশ করিতে না পারিলে তাহার রাজ্য রক্ষা এবং উন্নতির শীর্ষ স্থানাবলোকন একরূপ দুরূহ ব্যাপার। আমাদের সূর্য্যকান্ত একজন রাজনৈতিক সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজকার্য্যে তিনি বলের পরিচয় না দিয়া বরং কৌশলের পরিচয়ই অধিক দিয়াছেন। রাজ্য-বিস্তার এবং আয়বৃদ্ধি বিষয়ে কেমন ধীরে ধীরে কৌশল জাল বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক্ রক্ষা পূর্ব্বক নিজের কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইয়াছেন! সে বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেও স্তম্ভিত হইতে হয়! সুকৌশলী, নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সংসার-ময় দাবাখেলার ন্যায় কেমন একটা কৌশল জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, একটী মাত্র বৈরার চা'লেই রাজা প্রজা উভয়েই "মাৎ"—উভয়ের কেহই তুষ্ট বই রুষ্ট নহে,—অথচ কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি। রাজনীতির অভিজ্ঞতাই তাঁহার এত উন্নতির মূল!!

* শিকার কাহিনী।

তিনি যে কেবল প্রজা সাধারণের নিকট হইতেই ভক্তি শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে;—সমকক্ষ মহামান্য জমিদারবর্গের নিকটও তিনি বিশেষরূপ সম্মানিত ছিলেন। একমাত্র রাজনীতির সম্মোহন-মন্ত্রোচ্চারণেই দামোদরের বাঁধ-ভাঙ্গা জল-স্রোতের ন্যায় ভূম্যধিকারি-কুল-তিলকগণের সমবায় শক্তি-স্রোতেও অপ্রতিহতভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এক দিন তাঁহার সেই রাজনৈতিক গগনে কূট-মন্ত্রণার ঘন-ঘটা-সন্দর্শনে মহামান্য বড় লাট কুর্জ্জন বাহাদুরও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এই রাজনীতির অপরিসীম প্রতিভা-প্রদীপ্ত সমুজ্জ্বল কর-বিকাশে "জমিদারী কার্য্যে মহারাজা সূর্য্যকান্ত অদ্বিতীয় সুপণ্ডিত" বলিয়া সর্ব্বসাধারণের চোখে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন! হায়, যে পূর্ণচন্দ্র নিরীহ নির্ব্বোধ বলিয়া খেলার সাঁথিগণের সঙ্গেও মিশিতে পারিত না, আজ প্রতিভা ও সাধনা বলে সেই পূর্ণচন্দ্র সূর্য্যকান্ত রূপে রাজনীতিজ্ঞ ক্ষমতাবান্ কর্ম্মবীর বলিয়া জন-সমাজে সুপরিচিত! ধন্য প্রতিভা—ধন্য সাধনার বল!!

রাজভক্তি প্রদর্শন করা,—তৎপ্রচলিত নিয়মপ্রণালী অবনত মস্তকে পালন করা,—বৈষয়িক ব্যবহারে তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধন করা প্রজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনি রাজা হইলেও প্রজা, প্রজাধর্ম্ম সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তৎ-প্রতিপালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। রাজা, প্রজার পূজার পাত্র,—তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকা প্রজার কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্যের প্রতিপালনই শ্রেষ্ঠত্ব লাভের একমাত্র উপায়,—পক্ষান্তরে কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন, অধঃপাতের অতি নিম্নস্তর। মহামান্য মুনিপ্রবর কহিয়াছেন ঃ—

"প্রজানামেব রক্ষার্থং রাজা নিয়মমাবহেৎ।
অতো নিত্যং প্রজাঃ সর্ব্বাস্তিষ্ঠেয়ু রাজশাসনে॥"

আপস্তম্ব সংহিতা॥

সুতরাং রাজ-শাসনে বাধ্য থাকা প্রজা মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনায় কার্য্য করিতে পারিলে তাহার পরিণাম-ফল অতি শুভপ্রদ। সূর্য্যকান্ত বিচক্ষণ ছিলেন ;—তাই রাজ-পুরুষগণকে নানা উপায়ে সম্মানিত ও পরিতুষ্ট রাখিয়া কর্ত্তব্য-পালনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বিচক্ষণতা ধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিকের নিকট শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বলিয়া সমাদৃত হইবে, সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে বা প্রবৃত্তিতে আবাব অনেক অপকৃষ্ট সমালোচক কুৎসিত ভাবে সমালোচনা করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছেন। সংসার দোষে গুণে জড়িত,—দোষশূন্য কেবল গুণের সমষ্টি বড় একটা দেখা যায় না। সজ্জন ব্যক্তি দোষের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণের মাত্রাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঋষিপ্রবর কহিয়াছেন,—"সুর্পবদ্দোষান্নুৎসৃজ্য গুণান্ গৃহ্ণন্তি সজ্জনাঃ॥"

রাজার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না করিলে, তাঁহার মনস্তুষ্টি বিধানে যত্নপর না হইলে, রাজার নিকট প্রজার প্রতিপত্তি বাড়িবে কেন? প্রতিপত্তিই সম্মান লাভের নিদান। এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া সুপ্রসিদ্ধ নাটোর-রাজবংশের আদি পুরুষ রাজা রামজীবনের জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় রঘুনন্দন একদিন মুরশিদাবাদের নবাব মুরসিদ কুলিখাঁর দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র অপরিসীম ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন ;—রাজনীতিজ্ঞ রাজা টোডরমল্ল একদিন এই নীতির অনুসরণে দিল্লীশ্বর আকবরের সভায় রাজস্বসচিবরূপে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং কর্ত্তব্য পালনই কি রাজভক্তির মুখ্যোদ্দেশ্য নহে?

জগৎপূজ্যা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পবিত্র নাম জগতে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল ফণ্ডে" প্রচুর অর্থ দানাদি নানাবিধ সহায়তা* এবং ৪৫০০০৲ টাকায় মহামান্য সম্রাট সপ্তম

---

* "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল ফণ্ডের" সেক্রেটারী মহাশয় মহারাজা বাহাদুরের নিকট ১৯০৪ সনের ১৮ই এপ্রেল যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

এডওয়ার্ড ও সাম্রাজ্ঞীর দুইখানি চিত্রক্রয় করতঃ "মেমোরিয়েল হলে" স্থাপনপূর্ব্বক তিনি রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

যে যত বড় হয়, তাহার দায়িত্বও তত অধিক। মহারাজা সূর্য্যকান্ত তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়াই জীবনে মুহূর্ত্তের জন্যও রাজকার্য্য ভুলিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। প্রজার কার্য্য তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। অসুস্থাবস্থাতে হাওয়া পরিবর্ত্তনে স্থানান্তরে যাইয়া কিম্বা ব্যসনাসক্তি-বশে স্বীকার ব্যপদেশে গহন বিপিনে প্রবেশ করিয়াও রাজকার্য্য ভুলেন নাই;—তথায় থাকিয়াও প্রজার আপত্তি ভঞ্জনাদি কার্য্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কার্য্য ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কিছুই ছিল না।

নিয়মাবলী প্রচার।

প্রজাগণ যাহাতে অযথা উৎপীড়িত না হয়,—বিধিসিদ্ধরূপে তাহারা নিজ নিজ অধিকারে যাহাতে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারে,—অযথা অর্থ ধ্বংসে তাহারা যাহাতে নিঃস্ব হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে "জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী" নাম-করণে গ্রন্থাকারে প্রণয়ন পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্যমধ্যে প্রচার করেন। তাহাতে প্রজার মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে। ষ্টেটের সমস্ত কার্য্যই উক্ত নিয়মাবলীর বিধানানুসারে হইয়া থাকে। কার্য্যের এমন সুশৃঙ্খলা জমিদারী বিভাগে প্রায় দেখা যায় না।

Queen Victoria Indian
Memorial Fund.

April 18th 1904.

Maharaja Surja Kanta Acharjee

Sir,

I am desired by the Trustees of the Indian Victoria Memorial to express to you their sincere thanks for the following objects presented by you to the collection that is being made for the Memorial Hall.

Yours faithfully
Sd. (Instial)
Secretary.

অনেকেই তাঁহার পদানুসৃত হইয়া নানাবিধ নিয়ম প্রবর্ত্তন চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য এবং পুরুষকারের অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

যখন যেখানে যে কোনরূপ অভাব উপস্থিত হইয়াছে, মহামতি সূর্য্যকান্ত অমনি অযাচিত ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য অভাবমোচনের চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষে অন্নদান, রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়া দেওয়া,—দাতব্য চিকিৎসালয়াদি স্থাপন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। যে কার্য্যে সর্ব্ব সাধারণের উপকার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সেই কার্য্যেই তিনি বিদ্যমান;—সাধারণের হিতকর কার্য্যে মুহূর্ত্তের জন্যও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই।

রাজা উপাধি লাভ।

এই সময় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এবং কর্ত্তব্যসাধনার তেজোরাশি গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সুদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃঃ অব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাগৌরবসূচক "রাজা" উপাধিতে বিভূষিত হইয়া কর্ম্মবীর সূর্য্যকান্ত কর্ম্মময় জীবনে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।* এই সময় লর্ড লিটন বাহাদুর ভারতের বিধাতৃ-পুরুষ ছিলেন।

---

* 'রাজা' উপাধি প্রদত্ত হইলে পর, মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের সন্তুষ্টিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী আফিস হইতে ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত হইয়াছ :—

Belvedere
Feb. 28th 1880.

My dear Raja,

The Lieut: Governor disires me to convey to you his congratulations upon the honour, which the Viceroy, on his recomendation, has been pleased to confer on you.

Yours truly
(sd.) C. Henry.
for Private Secretary.

দানশীল সূর্য্যকান্তের অপরিসীম দয়া ও প্রজা-রঞ্জকতা এবং সাধারণের উপকার-স্পৃহাবলোকনে তাৎকালিক ছোটলাট স্যার এস্‌লি ইডেন বাহাদুর নিতান্তই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উন্নতি কল্পে যাহাতে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তৎপক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করিবেন বলিয়া একরূপ প্রতিশ্রুত হন।*

জুবিলি

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে "জুবিলি" উপলক্ষে দিল্লিতে এক দরবার হয়। দেশের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিই মহারাজ্ঞীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য এই দরবারে সমাগত হইয়াছিলেন। এই সময় ছোটলাট স্যার এসলি ইডেন্ বাহাদুরের

রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ।

অনুরোধ ক্রমে রাজা সূর্য্যকান্ত "রাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইলেন। উন্নতির পর উন্নতি,—আনন্দের সীমা কি? কর্ম্মই তাঁহাকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে লইয়া চলিয়াছে। †

---

* রাজা সূর্য্যকান্তের Liberality এবং Public spiritএ সন্তুষ্ট হইয়া ঢাকার কমিশনার সাহেব তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেওয়ার জন্য ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ৮ই জুলাই তারিখে ৩২০ নং পত্র দ্বারা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন এবং বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর তদুত্তরে কমিশনার মিঃ এফ, বি, পিকক সাহেবের নিকট ২৩শে জুলাই ১৫১৫ (F) নং পত্রে লিখেন যে, তিনি সূর্য্যকান্তের কার্য্যে নিতান্তই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সুযোগ মত ঐ উপাধি দেওয়ার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন।

† সূর্য্যকান্ত 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করিলে বঙ্গের ছোটলাট স্যার এসলি ইডেন বাহাদুর ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন যে :—

Belvedere.
19th February 1880.

Raja Bahadur,

I have much pleasure in congratulating on your promotion to the tittle of Raja Bahadur, which H. E the Viceroy has been pleased to confer upon you on the celebration of Her Majisty the Queen Empress' Jubelee in India.

I am your sincere friend
(sd).............
Lieutanant Governor of Bengal.

নবম সর্গ।

সম্পত্তি—বিস্তারে।

মহাত্মা বেঞ্জামিন ফ্রেঙ্কলিন্ তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের দৈনিক কর্ত্তব্য গুলি পূর্ব্বাহ্নে স্থির করতঃ তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন এবং দিবা-শেষে সেই সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইল কিনা, তাহার হিসাব করিয়া দেখিতেন। তিনি জীবনে কখনও ব্যসনে বশীভূত হইয়া মুহূর্ত্তকালও অলসভাবে অতিবাহিত করেন নাই। পর্য্যায়ক্রমে দৈনিক কর্ত্তব্য সাধনের পর জীবনের শেষ সময়ে তিনি অতীতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে বহু কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া তাহা কর্ম্মের গিরি রূপে পরিণত এবং নিজে উন্নতির অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ম্মময় জীবন ধন্য করিতে সক্ষম। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহাব দৃষ্টান্তানুসরণে কার্য্য করিলে মানুষের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের কর্ম্মবীর প্রতিভাশালী যুবক সূর্য্যকান্ত, মহাত্মা বেঞ্জামিন ফ্রেঙ্কলিনের কার্য্য প্রণালী এবং উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া নিজের জীবনও ঠিক তাঁহারই অনুকরণে গঠিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে মিঃ ডব্বল সাহেবের সংসর্গ, তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে কর্ম্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হওয়ার প্রণালী বিশেষরূপে দেখাইয়া দিয়াছিল। অনবরত কর্ম্মের সাধনা দ্বারা কিরূপে আত্মজীবন উন্নত করা যায়, তাহা ইংরেজ জাতির মধ্যে বিশেষ রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে; প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এক পেয়ালা চা পান করতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে কর্ম্মের সাধনা করিতে হয়, তাহা তাহারাই বিশেষ অবগত। তাই আমাদের সূর্য্য-কান্ত, সাহেব-সঙ্গ অতি আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিলেন এবং

ফ্রেঙ্কলিনের উপদেশ স্মরণ পূর্ব্বক মিঃ ডবল সাহেবের পন্থানুসরণে আত্মজীবন কর্ম্ম-সূত্রে গ্রথিত করিয়া লইলেন। সাহেব-সঙ্গের জন্য তাঁহাকে অনেক স্থলে নিন্দনীয় হইতে হইয়াছে; কিন্তু এই সাহেব-সঙ্গই তাঁহার জীবন কর্ম্মময়রূপে গঠন করার একমাত্র উপাদান।

যাহা হউক, সূর্য্যকান্ত প্রতিদিন নিয়ম মত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্রামের সময় ব্যতীত মুহূর্ত্তকালও কার্য্যে নিরস্ত হইতেন না। এইরূপে কিছুদিন কর্ম্মের পশ্চাতে ছুটাছুটী করার পর দেখিতে পারিলেন যে, নিবিষ্টচিত্তে কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, তেমন কঠিন বিষয়ও সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং কর্ম্ম-স্রোতে এমনই কি একটা আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান যে, একবার সে স্রোতে গা' ঢালিয়া দিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না,—কেবল দিবারাত্র কর্ম্মের দিকেই অগ্রসর হইতে সাধ যায়। কর্ম্ম-স্রোতে ভাসমান অবস্থায় যখন কর্ত্তব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উদ্ধত-পবনে নাচিতে নাচিতে আসিয়া আঘাতিত হয়, তখন দেহের লোমকূপে,—প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উৎসাহের অমিয় ধারা প্রবেশ পূর্ব্বক দেহে সঞ্জীবনী মন্ত্রশক্তির ন্যায় নব শক্তি সঞ্চার করিয়া দেয়; সে শক্তি মানুষকে কর্ম্মের সমাপ্তি সীমায় না নিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। তাই বলি, কর্ত্তব্যের সে তরঙ্গাঘাত বড় প্রীতি-বর্দ্ধক,—অতীব আরাম-দায়ক!! সূর্য্যকান্ত সে আঘাতে উৎফুল্ল হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত রাজকার্য্যপরিদর্শনে মনোনিবেশ করিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্যের সৌকর্য্য সাধনে যত্নপর হইলেন।

রাজকার্য্য স্বীয় হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক কিছুদিন কার্য্যান্তে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্পত্তি হইতে যে পরিমাণ আয় হইতেছে, ইচ্ছা করিলে সদুপায়ে অতি সহজে তদপেক্ষা অধিক আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কেননা, তখন অনেক স্থান বে-বন্দোবস্তী এবং বহু জমি পতিত অবস্থায় ছিল;—অথচ তাঁহার জমা ছিল না।

পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত মহালই ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। ইজারাদারগণ স্বীয় ইচ্ছানুরূপ আদায় তহসীলাদি করিয়া কিস্তিমত খাজানার টাকা সরকারে দাখিল করিত।

ইজারা বন্দোবস্ত

ইজারাদারের সহিত বন্দোবস্তের অতিরিক্ত যাহা কিছু আদায় হইত, তাহা সমস্তই ইজারাদারের লাভ। তিনি দেখিলেন, ইহাতে সরকারের ক্ষতি ভিন্ন লাভের মাত্রা একেবারেই নাই, বরং ইজারাদারগণেরই যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে। তারপর সেই সমস্ত ইজারাদারগণ হইতে প্রায়শঃ কিস্তিমত টাকা আদায় হয় না, তাহাতেও সরকারের বিস্তর ক্ষতি। অনেক সময়, অনেক টাকা অনাদায়ী বলিয়া খাস্তা দিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ মহাল ইজারা বন্দোবস্তে থাকার দরুণ বহু পরিমাণ জমি, ইজারাদারগণের যোগ সাজসে অথবা তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রজাগণ বিনা জমায় ভোগ করিত। ইহাতেও কম ক্ষতি হয় না।

তৃতীয়তঃ এক ইজারাদারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, রাজ্যের শাসন সমরক্ষণ রীতিমত হইয়া উঠে না; জঙ্গলাকীর্ণ 'পতিত' জমিগুলি তদ্বিরাভাবে 'হাসিল' না হইলে আয়বৃদ্ধি হয় না; সুতরাং উন্নতির আশাও নিতান্ত কম।

এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া সূর্য্যকান্ত বাবু একদিন মহালাতের বাকীজায় তদন্ত করিতে করিতে তপ্পে সাতশিকার জনৈক ইজারাদারকে তাহার নামে বিস্তর বাকীর জন্য অবসর করিয়া মহাল পুনঃ বন্দোবস্তের চেষ্টা করিতে আদেশ দিলেন। প্রার্থীরা বন্দোবস্ত গ্রহণে আসিয়া মহলের বিস্তর আয় বৃদ্ধি করিয়া দিল। পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত ইজারাদারই পূর্ব্ব বন্দোবস্তাপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ পরিমাণ টাকা দেওয়ার নিয়মে বকয়া পরিষ্কার করতঃ নূতন বন্দোবস্ত গ্রহণ করিল। যে ব্যক্তি, এই ইজারা মহালে কিছুই লাভ থাকে না ও রীতিমত খাজানাও আদায় হয়

না বলিয়া বহু টাকা বাকী রাখিয়াছিল, এখন সেই ব্যক্তিই প্রায় চতুর্গুণ টাকা দেওয়ার নিয়মে এক দিনে সমস্ত বাকী পরিষ্কার করতঃ নূতন বন্দোবস্ত কিরূপে গ্রহণ করিল ? এই টাকা কোথা হইতে দিবে ! যুবক সূর্য্যকান্ত তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইজারাদার বন্দোবস্তের সাকুল্য টাকাই মহাল হইতে আদায় করিবে এবং তদতিরিক্ত তাহার লভ্যাংশও আদায় করিবে,—একথা ঠিক। এতদিনও সে তাহাই করিয়াছে,—তবে সরকার অবগত নহেন। তাই ঠকিতে হইয়াছে। মনস্বী সূর্য্যকান্ত এই একজন ইজারাদার দিয়াই সমস্ত ষ্টেটের সংবাদ লইলেন ;—অনবরত চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার সম্পত্তি দ্বারা অন্যে লাভবান হইবে, নিজে কিছুই পাইবেন না, তাহা তাঁহার উন্নত প্রাণে সহ্য হইল না। তাই,

বন্দোবস্ত জরিপ

সমস্ত মহাল জরিপ করিয়া ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ হইতে ক্রমে নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ করিলেন। ইজারাদারের প্রতি নির্ভর না করিয়া বেতনভোগী লোক নিযুক্ত পূর্ব্বক ডিহি কাছারী স্থাপনের মনন করিলেন। তাহাতে জমি ও জমা উভয়ই প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া আয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল।

এই বন্দোবস্ত ব্যাপারে তাঁহাকে বিস্তর ধীরতা সহকারে কার্য্য করিতে হইয়াছে। বন্দোবস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধির দোষে অনেক ভূম্যধিকারীকে অপদস্থ হইতে দেখা যায়,—অনেকেই প্রজার বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি এমনই কৌশলক্রমে কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন যে, এক দিনের জন্যও কোন প্রজা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই।

আয়ের অংশ বিশেষ দ্বারা বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করিয়া স্থানে স্থানে ডিহি কাছারী স্থাপন করিলে মহালের বন্দোবস্ত, শাসন সংরক্ষণের তদ্বির,—জমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি,—সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর আয়ের

সংস্থান হইতে পারে বিবেচনা করিয়া স্থানে স্থানে "ডিহি কাছারী" স্থাপন করতঃ পূর্ব্বপ্রচলিত ইজারা প্রথা ক্রমে অপসারিত করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক ডিহিতে একজন নায়েব,—একজন জমানবীশ *—একজন সুমারনবীশ,—কয়েকজন মোহরের এবং আবশ্যক মত কয়েকজন পদাতিক ও বরকন্দাজ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহাতে একদিকে যেমন কতকগুলি লোক, প্রতিপালিত হইতে আরম্ভ করিল,—অপর দিকে তেমনই নানাভাবে প্রচুর আয় বৃদ্ধি হইল।

ডিহি কাছারী স্থাপন

এই সময় দেওয়ান গোবিন্দচন্দ্র বাগছি মহাশয় পরলোক গমন করিলেন এবং রাজভ্রাতা রাজকুমার মজুমদার মহাশয় সদর-কাছারী মুক্তাগাছায় "সদর নায়েব" বলিয়া অভিহিত হইলেন। ইনি লোক সমাজে সাধারণতঃ "নায়েব মজুমদার" মহাশয় বলিয়াই পরিচিত। ইনি জমিদারী কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বন্দোবস্ত কার্য্যে ইনি বিস্তর সহায়তা করিয়াছেন। বিগত ১৯০৩ খৃঃঅব্দে নবেম্বর মাসে মুক্তাগাছার বাসা বাড়ীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সদর নায়েব।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত যদিও পোষ্যপুত্র ছিলেন,—তথাপি পোষ্য-পুত্রের অশেষ গুণ গরিমার কিছুই তাঁহাতে ছিল না। বরং তৎপরিবর্ত্তে কার্য্যের তৎপরতা—স্থিরচিত্ততা,—ব্যসনে নিস্পৃহা,—যথাসাধ্য ব্যয়-সঙ্কোচ,—আয়-বৃদ্ধি,—সৌজন্য,—ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সৎগুণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া জগৎ চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

প্রায়শঃ পোষ্যপুত্রগণ নানাবিধ দূষিত ব্যসনাসক্তি প্রযুক্ত বাসগৃহের ইষ্টকখণ্ড বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; তিনি তাহা করিবেন দূরে

* পরে অনাবশ্যক বোধে এই পদ উঠাইয়া দেন।

থাকুক, মনঃপ্রাণে শিকার ব্যসনে লিপ্ত থাকিয়াও জন-সমাগম-শূন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যেও আয়ের পথ প্রশস্ত করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। সম্পত্তি বৃদ্ধি করা,—আয়ের পথ প্রশস্ত করা, তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

একদা শিকার উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ এলাকাস্থিত কোন এক বৃহৎ জলাশয়ের নিকট শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। জলাশয়টী যেমন সুবিস্তৃত, তেমন উহাতে প্রচুর মৎস্য ছিল বলিয়া অনুমিত হইল। মৎস্য ধৃত করার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে ধীবর আনয়ন করতঃ প্রচুর মৎস্য ধৃত করাইলেন এবং আবশ্যকের অতিরিক্ত মৎস্যগুলি গ্রামবাসিগণ মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। এই জলাশয়টীর কোনরূপ 'কর' ধার্য্য করা হয় নাই, এ কথা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া নিজে উহার জমা ধার্য্য করতঃ ধীবরগণ মধ্যে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ভূম্যধিকারি-জীবনের সাধনাই কড়া-ক্রান্তি লইয়া; সুতরাং এরূপ একটী বার্ষিক আয়ের পথ পরিত্যাগ করিবেন কেন? এ বিষয়ে যিনি লক্ষ্যহীন, তদবস্থাপন্ন ব্যক্তির প্রতি উপদেশচ্ছলে তিনি কহিয়াছেন;— "শিকার স্থলে আমি এমন অনেক বৈষয়িক ব্যাপারে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া থাকি। ইহাও আমার এক শিক্ষা। আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক জমিদার-সন্তানেরই মফঃস্বল ভ্রমণ উপলক্ষে এইরূপ নীতি অবলম্বনে উপকার সাধিত হইতে পারে। দিনে দিনে আমাদের যে অবস্থায় পদার্পণ করিতে হইতেছে; এবং ক্রমশঃ ব্যয়বাহুল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, বাদসাই চালচলন ছাড়িয়া এই সব উপায়ে ন্যায়ভাবে কিছু কিছু আয় বাড়াইতে পারিলে মন্দ কি? জমি পতিত আছে, জমা নাই; এ মহত্ত্ব এবং উদারতার আমি কখনই পক্ষপাতী না।"* ইহাতেই

* শিকার কাহিনী।

সম্ভবতঃ পাঠকগণের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে যে, আয় বৃদ্ধি করার স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে কতদূর বলবতী ছিল! হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং সাধনার বলে ক্রমে তাঁহার সেই মহতী ইচ্ছার পরিতোষ সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহাল বন্দোবস্তের দ্বারা আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন সম্পত্তি খরিদ দ্বারাও উহার উৎকর্ষতা সাধন করিতে লাগিলেন। কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের সংবাদ পাইলে তাঁহার হাতছাড়া বড় হইত না।

সের সাহাবাদ ইষ্টেট।

এই সময়ে মালদহ অধিবাসী মিঃ রবিন্‌সন্ নামক জনৈক ভূম্যধিকারী নানা কারণে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ায় মালদহ জিলাস্থ তাঁহার সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি 'সের সাহাবাদ', মহারাজা সূর্য্যকান্ত ১৮৭২ খৃঃ অব্দে খরিদ করিয়া নিজ সম্পত্তি-ভুক্ত করিলেন। এই সম্পত্তি দ্বারা তাঁহার প্রচুর পরিমাণে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আলাপ সিংহ প্রভৃতি পরগণায় যে সম্পত্তি আছে, এই সম্পত্তি তাহা হইতে পৃথকভাবে রাখিয়া "সের সাহাবাদ ইষ্টেট" নামে অভিহিত করা হইল। একজন ম্যানেজারের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই মহাল শাসিত হইতেছে। এই মহালের হেড কোয়ার্টার বা প্রধান কাছারী "কানসাট" নামক স্থানে স্থাপিত। মুক্তাগাছা,

কানসাট কাছারী।

সমস্ত সম্পত্তিরই সদর কাছারী হইলেও এই সম্পত্তির কাজকর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব ভার তথাকার ম্যানেজারের উপরই সম্পূর্ণ ন্যস্ত।

ক্রমে আলাপ সিংহ পরগণার ২নং জমিদারীর অংশবিশেষ,—সুসঙ্গ, তপ্পে রণ ভওয়াল, সেরপুর, হোসেনসাহী, পুখরিয়া প্রভৃতি পরগণা-স্থিত অনেক সম্পত্তি ক্রীত হওয়ায় তাহার রাজ্য বহুস্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

রাজা সূর্য্যকান্তের অভ্যুত্থান সময়ে এতদ্দেশে নীলকুঠীর সাহেবগণের প্রবল প্রতাপ বহুলাংশে প্রশমিত হইতেছিল। তখন তাহাদের ভাটার

সময়ঃ এই ভাটাই শেষ ভাটা। আর কখনও জোয়ারের বেগ ধারণে সমর্থ হয় নাই। কত নীলকুঠীর মদ-গর্ব্বিত অধীশ্বর বাহাদুর এই ভাটার টানে সম্পত্তি বিক্রয় করতঃ পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাতে প্রকৃতি-পুঞ্জ নিদারুণ মর্ম্ম-বিদারক অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করতঃ মনে মনে ভগবানের নিকট বিস্তর প্রার্থনা জানাইয়াছিল। তখনকার সেই নীলকুঠী, বর্ত্তমানে চা-কুঠীতে পরিণত হইয়াছে। প্রেতাত্মা সহজে দূরীভূত হইতে চাহে না।

নীলকুঠী।

যাহা হউক, নীলকর মিঃ হীল সাহেব, এই সময়ে বেগুণ বাড়ীস্থিত তাহার নীলকুঠী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে উহা রাজা সূর্য্যকান্ত ক্রয় করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী প্রজাবর্গ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বর্ত্তমানে এই স্থানে একটী কাছারী স্থাপিত আছে।

বেগুণ বাড়ীর কুঠী খরিদ

সময় সময় স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন জন্য স্থানান্তর যাওয়ার আবশ্যকতা বোধে স্বাস্থ্যপ্রদ পুণ্যধাম ৺বৈদ্যনাথ ধামে ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে কতক স্থান খরিদ করতঃ তথায় একটী বাটী প্রস্তুত করা হয়। হায়, কালে যে, এই পুণ্য বাস-স্থানই অন্তিমের বাসস্থানরূপে নির্ব্বাচিত হইবে,—নিয়তি যে, এখানেই শরজাল বিস্তার করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা কে জানে?

বৈদ্যনাথ কুঠী।

তাঁহার সুবিস্তৃত জমিদারী,—আমতলা, কানসাট, কামারগাঁও, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাপুর, জোড়বাড়ী, দাপুনিয়া, খিৎপুর, নসিরাবাদ, পাঁচটীকরী পূর্ব্বধলা, রড়ুইকান্দি, বলাশিয়া, বাহাদুরপুর, বাষদী, বালিদিয়া, বাকলজোড়া, বাজিৎপুর, বেগুণবাড়ী, মোহনপুর, লক্ষ্মীপুর, সদরডিহি এবং সেরপুর এই কয়েকটী ডিহি কাছারীতে বিভক্ত হইয়া সদর

ডিহি কাছারী।

মুক্তাগাছার অধীনে শাসিত হইতেছে। ইহার মধ্যে কোন কোন ডিহির অধীনে কয়েকটী সবডিহিও আছে, যথাঃ—খিৎপুর কাছারীর অধীন—উথুরী, মুখী ও শিলাসী; পূর্ব্বধলার অধীন—হোগলা; বলাসিয়ার অধীন—সেরাজাবাদ; বাহাদুরপুরের অধীন—তারাকান্দা; বাজিৎপুরের অধীন—অষ্টগ্রাম, খাটখাল, সাদকপুর; সেরপুরের অধীন—চীনামারা, শম্ভুগঞ্জ। এক একজন ডিহিদারের উপর এই সমস্ত সবডিহির কার্য্যভার ন্যস্ত।

এইরূপে কর্ত্তব্যের এবং কর্ম্মের সাধনাবলে সাধকশ্রেষ্ঠ সূর্য্যকান্ত, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, মুরসিদাবাদ, বগুড়া এবং পাটনা জিলায় বহু সম্পত্তি ক্রয় করতঃ ত্রিশ বৎসর মধ্যেই তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে দ্বিগুণ মাত্রায় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ জমিদার আর নাই।

দশম সর্গ

নানা কথা।

বর্ত্তমানে মুক্তাগাছা যেমন বহুলোকপূর্ণ,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—বড় বড় সহরের প্রশস্ত রাজপথবাহী মহাকোলাহলপূর্ণ জনস্রোতের সহিত নিজের ক্ষুদ্রস্রোত মিশাইতে অগ্রসর, পূর্ব্বে তেমন ছিল না, সহরের নামে মস্তক নীচু হইয়া পড়িত। স্থানে স্থানে ঘোর কণ্টকাকীর্ণ বেতসঝাড়ে পরিপূর্ণ থাকিয়া চলাচলের পক্ষে নিতান্ত দুর্গম ছিল। কোথাও লতা-

গুল্ম-পূরিত ঝোপের অন্তরালে সময়ে সময়ে হিংস্রক জন্তু লুক্কায়িত থাকিয়া অধিবাসীদিগের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিত। বর্ষাকালে কর্দ্দমের ভয়ে ঘরের বাহিরে যাওয়া দুষ্কর ছিল। ম্যালেরিয়াদি ব্যাধিনিচয় সংবৎসরকাল সমানে মুখ-ব্যাদান করিয়া বসিয়া থাকিত।

সূর্য্যকান্তের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় উন্নতিরও সূচনা হয়। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাবিধ চেষ্টা ও উদ্যোগে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে মুক্তাগাছায় মিউনিসিপালিটী স্থাপন করিয়া স্থানীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

মুক্তাগাছা মিউনিসিপালিটী

কয়েক বৎসরের মধ্যেই জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হইয়া পাকা পথ ঘাট প্রস্তুত হইতে লাগিল। ব্যাধির সংসারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। রোগের আক্রমণ আর তেমন রহিল না। বর্ত্তমানে মুক্তাগাছা ক্ষুদ্র একটী সহর বিশেষ।

এই মর-জগতে বসতি করিয়া কেহ কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, নিয়তির কর্ম্মবশে বাহিক বা মানসিক কোন না কোনরূপ অশান্তি-বিষের প্রাখর্য্য আছেই আছে। যুবক সূর্য্যকান্ত বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের কোমল ক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া স্বনাম-ধন্যা রূপসী পত্নী সহকারে সুখের সলিলে গা ঢালিয়া খেলিতে ছিলেন। সহসা কালের কঠোর নিনাদ শ্রবণে সে সুখ, স্বপ্নাবেশের ন্যায় অন্তহিত হইবার উপক্রম হইল। রাজ-রাজেশ্বরী দেবী বিভাবসু-বিলাসিনী পঙ্কজিনীর ন্যায় সূর্য্যতেজে সোহাগ-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে সহসা কাল-কীটের কঠোর দংশনে ম্রিয়মাণা হইতে লাগিলেন,—কি এক দুরারোগ্য দারুণ ব্যাধি তাঁহার সোণার শরীরে প্রবেশ করিয়া কালিমা-সংস্পর্শে তাঁহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিল। ময়মনসিংহ, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের বহু চিকিৎসক দেখান হইল,—অজস্র অর্থ ব্যয় হইল, কিন্তু ব্যাধির কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না।

পরিশেষে চিকিৎসকগণের অভিমত লইয়া স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তন জন্ত তিনি সস্ত্রীক 'গঙ্গা-সাগর' যাত্রা করিলেন। কিন্তু নিয়তির লিখন অখণ্ডনীয়। তথায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে (৯ই অগ্রহায়ণ বাঙ্গালা তারিখ) ভাগ্যবতী রাজরাজেশ্বরী দেবীর পুণ্যময় প্রাণ বহির্গত হইয়া গেল। সূর্য্যকান্ত সংসার অন্ধকার দেখিলেন।

গঙ্গা-সাগর যাত্রা।

এই নিদারুণ ঘটনায় তাঁহার প্রাণে যে আঘাত লাগিল—হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে দুর্ব্বিষহ শোকের তুফান বহিয়া গেল, সে নিদারুণ আঘাত, সে মর্ম্মবিদারক শোকরাশির ভাষা নাই, ভাব নাই, অর্থ নাই, অন্যকে বুঝাই-বার সাধ্য নাই, ভুক্তভোগী ব্যতীত সে যাতনা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই; সুতরাং তিনি কেমন করিয়া ব্যক্ত করিবেন! ক্ষত স্থানে লবণ-প্রক্ষেপের ন্যায় যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন।

দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াও যাহার ফুল্ল-নলিনী-নিন্দিত বদনচন্দ্রমায় প্রীতি-প্রফুল্লহাসির ছটা বিকীর্ণ দেখিলে দৈহিক মানসিক সমস্ত ক্লান্তি অপসারিত হইয়া যাইত।—রাজকার্য্যের কঠোরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াও একমাত্র যে মৃগ-নয়নার চিত্ত-বিনোদন স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ-ঈক্ষণে হৃদয়ে সুবিমল প্রেমের উৎস প্রবাহিত হইয়া প্রাণ শান্তি-রসে ডুবু ডুবু হইয়া থাকিত, সংসারে পিতা-মাতা-বন্ধু-বিবর্জ্জিত হইয়াও একমাত্র যে ক্ষুদ্র লতিকার দুশ্ছেদ্য-বন্ধনে জড়িত হইয়া সংসার সুখের নিদানভূমি বলিয়া মনে হইত, সেই সোহাগের ধন, প্রীতির নিদান, সংসার-ললামভূতা রাজ-রাজেশ্বরী দেবী কালের কঠোর শাসনে ইহ জগতের মায়া ভুলিয়া পরজগতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; এ মরজগতের উষ্ণ পবন-হিল্লোলে আর সে কুসুম দুলিবে না,—সে মৃদু মধুর সোহাগ-মিশ্রিত হাসির ছটায় আর সূর্য্যকান্তের তৃষিত প্রাণ পরিতৃপ্ত করিবে না; এ দুঃখ সহ্য করা যায় কি? যায়! নিয়তির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এ দুঃখও সহ্য

হয়। সহ্য না করিয়াই বা উপায় কি? শোকাকুল সূর্য্যকান্তের প্রাণেও সহিল,—সময়ের আবর্ত্তনে ক্রমে বেগ থামিয়া আসিল। কিন্তু প্রাণের অভাব আর পূর্ণ হইল না।

কিছুদিন পর ক্রমে আবেগ থামিয়া গেলে, তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে পুনঃ দার-পরিগ্রহে নানারূপে যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পত্নী-বিয়োগের সময় সূর্য্যকান্তের দেহরাজ্যে যৌবন-বসন্তের পূর্ণ-সমাগম,—প্রাণ যৌবনের উন্মত্ত-স্রোতে ভাসমান। ইচ্ছা করিলেই পুনঃ বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করিলেন না। একই স্থানে দুইটী চিত্র অঙ্কিত করিতে তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল,—মর্ম্ম বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। কাজেই বিবেক সম্মতিদান করিল না। মানবের জীবনে জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু একবার মাত্র হইয়া থাকে এবং উহাই বিধিসিদ্ধ প্রকৃতির নিয়ম। দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ভোগ-বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নহে, এ কথা তাঁহার প্রাণে পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতে লাগিল। বিবাহ, হাসির কথা নহে,—কিম্বা খেলিবার সামগ্রী নহে,—নিঃস্বার্থভাবে প্রাণের বিনিময়,—জীবনের পুণ্যময় প্রস্রবণ! তাই কবি কহিয়াছেন :—

"জীবন—এ বিশ্বময় নিঃস্বার্থ আপনাদান,
ইহ পরত্রের মাঝে ক্ষুদ্র এক ব্যবধান।
বিবাহ সে জীবনের পুণ্যময় প্রস্রবণ,
বিধাতার আশীর্ব্বাদ হৃদয়ের সম্মিলন॥"

যৌবনের উন্মত্ত প্রবাহে ভাসমান হইয়াও সূর্য্যকান্ত জীবনের এমন পুণ্যময় প্রস্রবণে এক স্মৃতি ডুবাইয়া অন্য স্মৃতির উপাসনায় বিবাহ নামে কলঙ্ক-কালিমা-লেপনে ইচ্ছা করিলেন না,—প্রাণের নিভৃত-কক্ষে পত্নীর সে সুখস্মৃতি জাগ্রত রাখিয়া আজীবন কর্ম্মের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বাহিনী ফল্গুর ন্যায় সে প্রীতির গুপ্ত সাধনাই সার করিলেন। সে

দৃঢ়তার নিকট বন্ধুজনের উপরোধ জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় নিরাশ-সলিলে বিলীন হইয়া গেল।

কিয়দ্দিবস এই ভাবে অতিবাহিত হইলে তাহার প্রাণে আর একটী বাসনা জাগিয়া উঠিল। মানুষের কার্য্যই এই; একটী বাসনার নিবৃত্তি হইতে না হইতেই অন্য একটী বাসনা আসিয়া উকি ঝুকি মারিতে থাকে। কাজেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি মনে ভাবিলেন, বিবাহ না করিলে সন্তান উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই,—সুতরাং ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের প্রয়োজন। এইরূপ পরিবর্ত্ত-চিন্তায় প্রাণে এক আবেগ উপস্থিত হইল,—এই আবেগ হইতেই পোষ্য গ্রহণে মতি জন্মিল।

দত্তক গ্রহণ শশীকান্ত।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শশীকান্তকে মহা সমারোহে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন।

কঠোর পরিশ্রমের সহিত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বহস্তে ষ্টেটের কার্য্য

চীফ্ ম্যানেজার নিযুক্ত।

পরিচালন পূর্ব্বক একটু অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা জিলার অন্তর্গত শেখরনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ রায় বি, এল, মহোদয়কে উপযুক্ত জ্ঞানে চীফ্ ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় করণীয় যাবতীয় কার্য্যের ভার তাহার উপর দিয়া নিজে কলিকাতাবাসী হইলেন।

শ্রীনাথ রায়।

শ্রীনাথ বাবু, নিজের মহত্ত্ব, সহৃদয়তা, ন্যায়-পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীতে অল্পকাল মধ্যেই প্রজা এবং উপস্থিত লোক মণ্ডলীর প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন। ইনি যেমন জ্ঞানী, তেমন নীতিকুশল—তেমনই প্রজাবৎসল। প্রজার কার্য্যে বিরক্তিবোধ

মাত্রও নাই। প্রজাগণ গায়ে পড়িয়া কথা কহিলেও ক্রোধের বশীভূত হন না। এই সব মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া প্রজাগণ তাহার বাৎসল্যের শান্তিশীতল ছায়ার আশ্রয় লাভ করিয়া অতীব আনন্দ সহকারে তাহাকে "মাটীর ম্যানেজার" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক হৃদয়ের প্রভূত ভক্তির বিকাশ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় নাই।

১৮৯৭ খৃঃঅব্দে "ডায়মণ্ড জুবিলি" উপলক্ষে দিল্লিতে এক দরবার হয়। সময়োপযোগী আমোদ-স্রোতে দেশ প্লাবিত হইয়া যায়।

ডায়মণ্ড জুবিলি।

এই সময় কর্ম্মবীর সূর্য্যকান্ত, প্রতিনিয়ত সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্ত এবং গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া মহাসম্মানসূচক "মহারাজা" উপাধিতে ভূষিত হইয়া উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সাধনার বলে সংসারে কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীয়মান হইল,—মুক্তাগাছার আচার্য্যবংশ ধন্য হইল।

মহারাজা উপাধি লাভ।

মহামান্য ছোট লাট বাহাদুর তাহাকে 'মহারাজা' উপাধির সনদ প্রদান করিতে গিয়া অতি আনন্দ সহকারে কহিয়াছিলেন ঃ—

"Maharaja—Born as You were in a family of distinction, you have warthily upheld and more than upheld the credit of that family. You were vested with the tittle of Rai Bahadur on the occation of the Imperial Assamblage on the 1st. January 1877. You were made a Raja in 1880 and a Raja Bahadur at the celebration of the Jubilee of Her Majisty's reign in 1887. But though you had attained these high distinctions, you none the less continue to pursue that honourable course of conduct by which you had gained them. As a wealthy

Zaminder you have had many opporetunities of doing good, and your noble liberality in improvi g the water supply of Mymensingh in only one of your numerous tittles to the public gratitude, though it is the most conspicious of them. But not merely your own ryots and neigh bours have received your bounty, the Thomson Medical Hall at Dacca, the Imperial Institute in London, the Jubilee Sanitarium in Darjiling and other Institutions have reaped the benifit of your far-reaching liberality. But the distribution of money is not the only form, in which this liberality is shown. You are known as a man of liberal veiws and a promoter learning. It has been felt that such merits as these deserve recognition both as an acknowledgment due to you personally, and as an encouragement to others to imitate so excellent an example. You have, now, therefore, on the auspicious occation of the Diamond Jubilee of Her Majisty's the Empress, been raised to the rank of Maharaja and it is with great pleasure that I present to you the 'Sanad' confering that dignity upon you and the 'Khelat' which accompanies it."

ভূমিকম্প।

এই বৎসর (বাঙ্গালা ৩০ জ্যৈষ্ঠ) ১২ই জুন তারিখে অপরাহ্ণ ৫।১১ মিনিটের সময় ভীষণ ভূমিকম্পে দেশ উৎসন্ন যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। এরূপ প্রবলবেগে ভূমিকম্প আর কখনও হয় নাই বলিয়া অনেক প্রাচীন ব্যক্তি ব্যক্ত

করিয়াছেন। এই ভূমিকম্পে মহারাজা বাহাদুরের মুক্তাগাছা স্থিত দ্বিতল প্রাসাদ এবং নসিরাবাদস্থ সুসজ্জিত 'রঙ্গমহল' ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। এই ভূমিকম্পে তাঁহাকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।

ভূমিকম্পের ভীম গর্জ্জন ভেদ করিয়া দেশবাসিগণ দুরবস্থার একশেষ ভোগ করিয়াও যখন দীন-প্রতিপালক সূর্য্যকান্তের সম্মান সূচক উপাধি লাভের কথা শুনিতে পাইল, তখন তাহাদের ভয়-বিত্রাসিত বিপন্ন জীবনেও সুখের উৎস উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। দেশের দুরবস্থা নিজের অভাব ইত্যাদি সমস্ত ভুলিয়া আনন্দোল্লাসিত ভক্তি-গদ্-গদ চিত্তে মহারাজা সূর্য্যকান্তের ময়মনসিংহ শুভাগমনে এক তানে গাহিয়াছিল :—

"এস গৃহে সূর্য্যকান্ত চিরদ্যুতিমান্
বঙ্গের গৌরব রবি, প্রতিভার পূর্ণচ্ছবি
অতল উদার হৃদিপ্রশান্ত মহান্!
এসহে প্রজার বন্ধু, অপার দয়ার সিন্ধু,
স্বদেশ-প্রেমিক ধীর, জ্ঞানী গরীয়ান্!
কীর্ত্তির কিরীট শিরে, আসিয়াছ দেশে ফিরে
রাজাধিরাজের কাছে লভিয়ে সম্মান।
যোগ্যোপাধি যোগ্যজনে, নিরখিয়ে প্রজাগণে
করিছে আনন্দ ধ্বনি নিনাদি বিমান।
সদা পরহিতে রত, তুষিতে তৃষিত চিত,
স্নেহের প্রবাহ তব ওই বহমান।
'ধন্যা রাজরাজেশ্বরী মরতে অমর নারী'
বাজিছে অযুত কণ্ঠে আজি একতান।
হে দেব এ দুরদিনে দুরভিক্ষ অনশনে
তোমারি উন্মুক্ত হস্ত বাঁচায়েছে প্রাণ।

যেদিকে ফিরাই আঁখি, 'তোমারি করুণা দেখি
ওই সারস্বত ভূমি তোমারি ত দান।
তোমারি টাউন হলে, বাণী-পুত্রগণ মিলে
জ্ঞানের পিপাসা জ্বালা করে অবসান।
এ সুখের দিনে আজ, কি দিব হে মহারাজ?
দীনের শ্রদ্ধার পুষ্প লহ মতিমান্।
যে দেব চরণোপর, শোভে পারিজাত থর,
পলাশ কি পাশে তার নাহি পায় স্থান?
আনন্দ উদ্বেল হ'য়ে, মানস-কুসুম লয়ে
আসিয়াছি আজি তাই দেব সন্নিধান।
চিরজীবী হ'য়ে রও, প্রাণের আশীষ লও,
সতত সাধন কর দেশের কল্যাণ।
ল'য়ে 'সূর্য্য' তেজোরাশি, ওই যে হাসিছে 'শশী',
বিধাতা করুন তার মঙ্গল বিধান।"

আলেকজেণ্ডার কেছ্‌ল।

এই সময় ময়মনসিংহ সহরে "আলেকজাণ্ডার কেছ্‌ল" নামে একটী মনোহর বাগান বাটী নির্ম্মিত হয়। সাধারণে ইহা 'লোহার কুঠী' বলিয়াই বিখ্যাত। মহারাজা সূর্য্যকান্ত ময়মনসিংহ আসিয়া এই বাটীতেই অবস্থান করিতেন। এরূপ সুন্দর বাগান বাটী প্রায়ই দেখা যায় না। মিঃ আর, কেলছেল সাহেবের তত্ত্বাবধানে বাগানের কার্য্য পরিচালিত হয়।

শশিলজ।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পে ময়মনসিংহের পেলেস (Palace) বিধ্বংস হইলে পর সেই ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। এখনও উহার কার্য্য শেষ হয় নাই। তাঁহার আশা ছিল, এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইলে তাহাতে বাস করিয়া সুখী হইবেন।

হায়, নিষ্ঠুর কাল সে বাসনাপূর্ণ করিতে দিল না। এই প্রাসাদের নাম "শশিলজ"।

সূর্য্যকান্ত হল।

"সূর্য্যকান্ত হল" নামক পুরাতন টাউনহলটী এই শশিলজের কম্পাউণ্ড ভুক্ত করিয়া নূতন আর একটী টাউনহল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দালানটী দেখিতে অতি মনোরম।

একাদশ সর্গ।

দুষ্ট দমনে।

দুর্জ্জন দমন করিয়া সজ্জনকে রক্ষা করা রাজধর্ম্মের আর একটী কর্ত্তব্য। রাজশক্তি শিথিলতা প্রযুক্ত বিপথগামিনী হইলে দুর্জ্জনের প্রকোপ বৃদ্ধি এবং তদ্দরুণ দেশে অশান্তি, সজ্জনের লাঞ্ছনা প্রভৃতি অধর্ম্মাচরণে রাজ্য ক্রমে উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। রাজশক্তি যদি সেই দুষ্টশক্তি বিনাশে যত্ন না করে, তাহা হইলে নিরীহ প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষা হয় না, অধিকন্তু একের দৃষ্টান্তানুকরণে অপরে পাপ মস্তক উন্নত করিয়া লয়। সুতরাং দুষ্টের হস্ত হইতে প্রজার রক্ষা সাধন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন :—

"চাটু তস্কর দুর্ব্বৃত্ত মহা-সাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ ভৃত্যবর্গো বিশেষতঃ ॥"

১ম অধ্যায় ৩৬৬ শ্লোক।

প্রকৃতিপুঞ্জের সমবায় শক্তি যে মহাপুরুষে একীভূত হইয়াছে, তিনিই রাজা, তাহার শক্তির নামই রাজশক্তি। প্রজাগণ এই রাজশক্তির নিকটই অবনত হইয়া থাকে। দুর্জ্জন যখন ভৈরব নিনাদে বিকট হুহুঙ্কার

ছাড়িয়া মদগর্ব্বিত উন্নত-মস্তকে প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ বিপুলবিক্রমে সজ্জনের উপর কঠোর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, তখন রাজশক্তিই সজ্জনের একমাত্র আশ্রয়,—তদ্ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। সুতরাং আশ্রিতজনকে রক্ষা করা রাজশক্তির অন্যতম কর্ত্তব্য। এই নীতির বশীভূত হইয়াই রঘু-কুল-তিলক রামচন্দ্র দুষ্টা তাড়কা রাক্ষসীকে হত্যা করিয়া মুনিগণের যজ্ঞ স্থান রক্ষা করতঃ পাপের বিনাশে পুণ্যের সংস্থান করিয়াছিলেন, রাজধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য স্ত্রীহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

রাজধর্ম্মপরায়ণ সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে এই সৎসাহস বিশেষ রূপেই স্থান পাইয়াছিল। তিনি দুর্জ্জনকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। যে কোন উপায়ে হউক দুষ্ট-দমন তাঁহার জীবনের এক প্রধান ব্রত ছিল।

সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ তাঁহার দেহকান্তিতে এমনই কি এক ভীতি-ব্যঞ্জক প্রচ্ছন্ন তেজের সমাবেশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, যে কেহ কোন দুষ্টাভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট গমন করিলে প্রথম দর্শনেই তাহা পরিব্যক্ত হইয়া পড়িত। তাঁহার সেই পাংশুজালাচ্ছাদিত অগ্নিঅংশুর ন্যায় তেজঃ-পুঞ্জের নিকট মানুষ মাত্রেই ন্যূনাধিক বশ্যতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার নামের দোহাই দিলে উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিও একবার দমিয়া পড়িত। হিংসা-প্রণোদিত-প্রাণে অন্যের অনিষ্ট সাধন জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক অপরের বিরুদ্ধে কূট মন্ত্রণা-জাল-বেষ্টিত দ্রোণ-ব্যূহের ন্যায় অন্তঃপ্রবেশ-পন্থা-বিবর্জ্জিত চক্র-ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেও তিনি অনায়াসে মুখশ্রী দর্শন মাত্রেই সে ব্যূহ রচনা ব্যর্থ করিয়া দিতেন,—হিংসুকের পর-বিধ্বংসী তীব্র হলাহল তাহার সে অমিত তেজঃপ্রভার নিকট নিস্তেজ হইয়া পড়িত। কুটিলতার তীব্রকুঞ্চন-কান্তি এবং সরলতার শুভ্র-জ্যোতিঃ, হংস দ্বারা উদকমিশ্রিত দুগ্ধ পৃথকের ন্যায় তিনি সুন্দররূপে পৃথক করিয়া বুঝিতে পারিতেন।

এমন অনেক দেখা গিয়াছে, যে সমস্ত ব্যস্ত-বাগীশ বাহিরে উচ্ছৃঙ্খল বক্তৃতার তীব্র উচ্ছ্বাসে সংসার ভাসাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা মহারাজা সূর্য্যকান্তের নিকট গিয়া ভয়বিজড়িত-কণ্ঠে দুই চারিটী কথা বা শব্দের গিলিত-চর্ব্বণ দ্বারা আপন উদ্দেশ্য ভ্রান্ত হইয়া পড়িত, কেহ বা এরূপ স্থলে মুকত্বের পরিচয় দিতেও ক্রটী করেন নাই। পাপ থাকিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্তে ভয়।

পর-নিন্দুক বা কোট্‌নাখ্যাধারী পুতনা বিশেষকে তিনি অতি ঘৃণার চোখে দেখিতেন। রাজকার্য্য পরিচালনের সুবিধার জন্য কুটনীতির কথা শুনিতেন বটে, কিন্তু তাহাকে আজীবন ঘৃণার চোখেই দেখিতেন। নিন্দুককে স্বর্ণ-সিংহাসন কদাচই প্রদান করেন নাই। বরং উচিত-বক্তা এবং সত্যবাদীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার ভ্রম তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পারিলে তুষ্ট বই রুষ্ট হইতেন না।

দুষ্ট দমনে তাহার শাসন দণ্ড সর্ব্বত্রই পরিচালিত হইত, কেবল নিজের প্রজাগণ মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত না। সরিক-তরফের এলাকা মধ্যেও সে তেজঃ বিকীর্ণ হইতে দেখা যাইত।

এক সময়ে মুক্তাগাছার তিন মাইল পূর্ব্বদিকস্থ সত্রাসিয়া গ্রামের কতিপয় দুর্বৃত্ত গ্রাম মধ্যে বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহাদের অত্যাচারে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা দিয়া পর্য্যন্ত কেহ নির্ভয়ে যাতায়াত করিতে পারিত না। অনেক বড় বড় লোককেও এই স্থানে "নাকানি চুবানী" খাইতে হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী অধিবাসীরা অতি সশঙ্কচিত্তে নিজ নিজ ধনজন লইয়া বাস্তব্য করিত। গবর্ণমেণ্ট হইতে শাসনের ব্যবস্থা হইত বটে, কিন্তু প্রমাণাদির অসদ্ভাবে এবং নানা কারণে কিছুই হইয়া উঠিত না। এই মহাল বা প্রজা বিভিন্ন সরিক তরফের এলাকাধীন হইলেও আচার্য্য-কুল-তিলক সূর্য্যকান্ত, তৎ প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া কর্ত্তব্যের সাধনায় শাসন

সত্রাশিয়ার দুর্জ্জন শাসন।

দণ্ডের তীব্রতেজঃপ্রভাবে এই দুষ্ট দল নষ্ট করিয়া এতই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন যে, উহারা তাঁহার নাম শ্রবণে কম্পিতকলেবর হইত,—জীবনে আর কখনও মস্তকোত্তোলন করে নাই।

মাণিক খলিফার দল বিনাশ।

ইহার পর মুক্তাগাছার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে আর একটা দল গঠিত হয়, মাণিক খলিফা এই দলের নেতা। ইহারা জমিদারের শাসন আমলে আনিত না। নিজেরা বিদ্রোহী হইয়া অপরকে সেই সুযোগ দেখাইয়া দিত। এই দলে তরবারী, সড়কী প্রভৃতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাদিও ব্যবহৃত হইত। দুষ্টদল-বিধ্বংসী সূর্য্যকান্ত ইহাদিগকে দমন করিয়া উপহাসিত রাজশক্তির সম্মান রক্ষা এবং অপরের প্রাণে ভীতির তীব্র হলাহল ঢালিয়া দিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

লব ব্যাঙ্গ দমন।

ঘাটুরী অঞ্চলের লব ও ব্যাঙ্গ নামক দস্যুদলপতি-দ্বয়ের দমন কার্য্যেও তিনি প্রজার কম উপকার করেন নাই। এই দস্যু-সহোদর-দ্বয়ের অত্যাচারে ধনীর ধন, মানীর মান, সতীর সতীত্ব, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, এক সময়ে পদ্মপত্র-স্থিত সলিল বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া [illegible]। জনৈক মহাত্মা ইহাদের দমন কার্য্যে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া রিপু-দমন সূর্য্যকান্তের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তিনিও যথেষ্ট সহায়তা প্রদানে গবর্ণমেণ্টের শাসনদণ্ডে দণ্ডিত করাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্তগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইল,—গ্রামবাসিগণ যেন হাফ ছাড়িয়া মৃতদেহে প্রাণ পাইল।

"মহারাজের প্রতি দেশের জন সাধারণের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষিত হয়,—জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ফিলিপের কীর্ত্তি কাহিনীর সময়। উদ্ধত যুবক ম্যাজিষ্ট্রেট ফিলিপ, মিউনিসিপালিটী ঘটিত একটা তুচ্ছ মোকদ্দমায়, মহারাজা বাহাদুরকে, আসামী শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া, তাঁহাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছিলেন। সেইসূত্রে বিলাতে ভারতে তুমুল আন্দোলন

উপস্থিত হয়। সেই আন্দোলনে তাৎকালিক ছোটলাটের আসন বিচলিত হইয়াছিল; এবং গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ক্ষুণ্ণ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি, সেই উপলক্ষে, ম্যাজিষ্ট্রেট ফিলিপকে শেষে মহারাজা সূর্য্যকান্তের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। ফিলিপের ব্যাপারে মহারাজ যেরূপ দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজের যশঃ খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।" *

ফিলিপের মোকদ্দমা।

মহারাজা সূর্য্যকান্তের রাজত্বে বিদ্রোহিতা-রূপ বহ্নি-তেজঃ অধিক সহ্য করিতে হয় নাই। তাহার রাজ-শক্তির কঠোরতা বলে দুর্জ্জনগণ আপনা হইতেই চক্রান্ত ছাড়িয়া দিত। তবে সময় সময় দুই একটী কেউটে মস্তক উঠাইয়া ঘুমন্ত শার্দ্দূলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কঠোর শাসনদণ্ড চালনা-রূপ ওষধির সংস্পর্শে মস্তক ছাড়িয়া দিয়া বিকট ভ্রুকুটী দর্শনে বিবর্ণ হইয়া যাইত!! এইরূপ সৎসাহসের পরিচয় না দিলে জীবনে এত উন্নতি হইবে কেন?

দ্বাদশ সর্গ।

মৃগয়ায়।

সংসার কর্ম্মের লীলাভূমি। কর্ম্ম ব্যতীত এখানে আর কিছুই নাই। কর্ম্মের সাধনাই জীবনের উদ্দেশ্য এবং এই সাধনা লইয়াই মানব বিব্রত। দিবারাত্র কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের শেষ নাই। কর্ম্মে পরিশ্রম,—পরিশ্রমে ক্লান্তি! এই ক্লান্তিনাশ একান্ত আবশ্যক। এক দিকে যেমন কর্ম্ম সম্পাদনে পরিশ্রম প্রয়োজনীয়,—অপর দিকে তেমনই উপযুক্ত বিশ্রামের

* ১৩১৫ সনের ১৫ই কার্ত্তিকের বঙ্গবাসী।

আবশ্যক। মন যাহাতে অবসন্ন না হয়, কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তদ্ব্যবস্থাও সর্ব্বদা কর্ত্তব্য! "Recreation of mind is needful in every life."—কর্ম্মী মাত্রেরই এ কথা স্বীকার্য্য। নতুবা সুষ্ঠুরূপে কর্ম্মের বিকাশ অসম্ভব।

অবসন্ন হৃদয়ে নূতন রকমের উদ্দীপনা বা স্ফূর্ত্তির আবেগ ঢালিয়া দিলে, আভ্যন্তরিক বৃত্তিগুলি সতেজ হইয়া বিপুল উদ্যমের সহিত মানুষকে কর্ম্মের পথে চালিত করে। স্ফূর্ত্তিবিহীন মানব-জীবন, তৈলশূন্য নেমীর ন্যায় কর্ম্মের অবিশ্রান্ত সংঘর্ষণে তিল তিল করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে অতি অল্প দিন মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্যসনানুরক্তি হইতে উদ্দীপনার সৃষ্টি;—উদ্দীপনা, উৎসাহের চালক,—আবার উৎসাহই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সুতরাং ব্যসনানুরক্তির বিচার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বিচার-শূন্য হইলে জীবনে অনেক বিপদের মুখাবলোকন করিতে হয়। ইহাতে কেহবা মানব বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইতে পারেন, আর কেহবা অধঃপাতের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়া প্রেত-পুরীর প্রেত-লীলা দর্শনে নিজেও অনায়াসে প্রেত সাজিয়া তাহাদের তাণ্ডব নৃত্যে যোগদান করিয়া থাকেন।

শিকার অথবা মৃগয়া, এক প্রকার ব্যসন। উহা নির্দ্দোষ,—অথচ তাহাতে রীতিমত পুরুষকার দেদীপ্যমান। তবে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" যাঁহাদের মূলমন্ত্র, তাঁহারা কি বলিবেন জানি না,—রাজধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে উহা সর্ব্বথা পরিরক্ষণীয়। মহাকবি কালিদাস কহিয়াছেন ঃ—

> "মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহযোগ্যং বপুঃ
> সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
> উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
> মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ॥"—শকুন্তলা।

আমাদের মহারাজা সূর্য্যকান্ত কৈশোরের সুকুমার বৃত্তি মধ্যে নিবদ্ধ থাকাবস্থা হইতেই এই শিকার ব্যসনে অনুরক্ত ছিলেন। যখন কলিকাতা ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশনে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করিতেন, তৎকালেও সময় সময় দম্‌দমা প্রভৃতি অঞ্চলে আসিয়া শিকারানুসরণে ব্যাপৃত থাকিতেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহাকে বিস্তর উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহার উৎসাহেই প্রাণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিত। সে উত্তেজনা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। আজীবন কর্ম্ম-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এই পুরুষোচিত ব্যসনে অনুরক্ত থাকিয়া মানসিক দৌর্ব্বল্যের অপনোদন করতঃ যাহা কিছু বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর কোথাও বিশ্রামলাভ ঘটিয়া উঠে নাই কিম্বা অন্য কোন ব্যসনেও অনুরক্তি ছিল না।

বৎসরের সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া দুরন্ত শীতঋতুর মৃদুমন্দ হিম বায়ু-সঞ্চালনের সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিত! অন্তঃসলিলা ফল্গুপ্রবাহের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় গুপ্ত সুখের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিত। মধুর বসন্ত সমাগমে প্রাণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিত;—কুসুমিত কুঞ্জবনে ভ্রমর-গুঞ্জনে,—কোকিলের ললিত মধুর পঞ্চমে,—গোলাপ-বঁধুর ভরা যৌবনের প্রেমোদ্ভাসিত মৃদু মধুর হাস্যালাপে, শিকারের অদম্যোৎসাহে তাঁহার প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠিত,—সুরঙ্গিনী কুরঙ্গিণীর চকিত কটাক্ষের স্মৃতি মনে করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না।

কোথাও শার্দ্দূল-সমাগমের সংবাদ পাইলে, অমনি শিকার-লোলুপ সূর্য্যকান্ত বন্দুক হস্তে দণ্ডায়মান; মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম নাই,—আহার নাই,—নিদ্রা নাই,—বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ নাই; শিকার নিয়াই ব্যতি-

ব্যস্ত। শিকার পাইলে অন্য কথা নাই। শিকার-লালসার নিকট দৈহিক-যাতনা তুচ্ছ।

তাঁহার জীবনে মধুপুর, ভাঁওয়াল, সুশঙ্গ, শ্রীহট্ট, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বহু শিকার করিয়াছেন,—এ কার্য্যে বহু অর্থব্যয় হইয়াছে,—জীবনে অনেকবার হতাশ হইয়াছেন, তথাপি এ বাসনার পরিসমাপ্তি করিতে পারেন নাই। তৎপ্রণীত "শিকার-কাহিনী" নামক পুস্তকে এ বিষয়ে তিনি অনেক কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শিকারের কি এক সম্মোহিনী আকর্ষণী শক্তিতে তাঁহার প্রাণ আকর্ষিত, তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার এই শিকার স্পৃহার পরিচয় পাইয়া দেওয়ানগঞ্জ হইতে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের অধিবাসিগণ তাঁহাকে "বাঘুয়া রাজা" উপাধি প্রদান করিয়াছিল। শিকারীর উপযুক্ত আখ্যা লাভে তিনি এইরূপ সম্বোধনে পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। শিকার-বাহিনী গমনের সময়, দন্তিযূথের গলদেশে বিলম্বিত ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে যখন ঐ সমস্ত গ্রামবাসী সমবেত হইয়া "ঐ যে, বাঘুয়া রাজা বাঘ শিকারে যায়" বলিয়া একে অপরকে দেখাইয়া দিত, তখন শিকারী সূর্য্যকান্তের প্রাণে কি এক সুবিমল আনন্দের বিদ্যুচ্ছটা প্রবেশ করিয়া হৃদয় নাচাইয়া তুলিত!! সে আনন্দ অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়!!! উল্লাসিত প্রাণে আরও উৎসাহের পীযুষ ধারা ঢালিয়া দিত।

বাঘুয়া রাজা

শিকার বিষয়ে তাঁহার অদম্য উৎসাহ,—ঐকান্তিকী প্রীতি, উপলব্ধি করিয়া শিকারী-শ্রেষ্ঠ মিঃ আফকার সাহেব অতিশয় পরিতোষ সহকারে তাহার বহুমূল্য উৎকৃষ্ট সখের বন্দুকটী উপযুক্ত শিকারী সূর্য্যকান্তের হস্তে দিয়া বিস্তর সুখানুভব করিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর অধিকাংশ সময়ে এই বন্দুক দ্বারাই শিকার করিতেন—এইটী তাহার অতি আদরের ধন

আফকার গান

ছিল। ইহাতে আট নম্বরের গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই বন্দুকটী তাঁহার এতই প্রিয়বস্তু ছিল যে, শিকারের কথা হইলেই উহা স্মৃতিপথে জাগ্রত হইয়া উঠিত। উহা ব্যতীত যেন শিকার হয় না ইহাই তাঁহার মনের ভাব। এমন কি, স্বীয় রচিত সঙ্গীত মধ্যেও উহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

আমেরিকার জনৈক সম্ভ্রান্ত শিকারী তাহার সহিত শিকারে যাইয়া, শিকারে তাঁহার নৈপুণ্যাবলোকনে প্রীত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা সহযোগে স্বীয় বন্দুকটী তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তু মাত্রেরই উপযুক্ত স্থানে ন্যস্ত হইলে সুখের বিষয় বটে!! এই বন্দুকটী ওজনে প্রায় ষোল সের হইবে।

বড় ও ভারী বন্দুক

মহারাজার শারীরিক গঠন এবং স্বাস্থ্য উভয়ই শিকারীর উপযুক্ত ছিল। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে পরিশ্রমী হওয়া যায় না,—আবার পরিশ্রমী না হইলে শিকারী হওয়া অতীব কঠিন। এই কার্য্যে অনেক সময়, পলায়নতৎপর শিকারের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া হয়ত সমস্ত দিনই অনাহারে কাটাইতে হয়,—অনেক সময় পদব্রজে চলিয়া অতি সন্তপ্ত-হৃদয়ে অরণ্যানী সঙ্কুল দুস্তর প্রদেশে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়। সামর্থ্যহীন ব্যক্তি, কিম্বা ব্যাধির বিকট ভ্রূভঙ্গি-দর্শনাশঙ্কা সন্ত্রাসিত ব্যক্তির পক্ষে এই বিপজ্জনক কার্য্য খাল কাটিয়া ঘরে কুম্ভীরানয়নের ন্যায় শঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে।

তিনি শিকারোৎসাহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া অনেক সময় অনেক বিপদে পতিত হইয়াছেন,—অনেক সময়, অমূল্য জীবন রত্ন হিংস্রজন্তুর করাল কবলে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলেন, তথাপি উহাতে বীতস্পৃহ হন নাই। হৃদয়ের দৃঢ়তা-বলে বিপদ্‌কে বিপদ্ বলিয়া মনে

করেন নাই। মহাত্মা মাত্রেই মৃত্যুর জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত; সুতরাং দৃঢ়তা বিদূরিত হইয়া প্রাণে আতঙ্কের ছায়া পড়িবে কেন ?

শিকারোদ্দেশে অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে শিকারের উপকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত না হইলে, অথবা সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া শিকার-লাভে নিরাশ না হইলে, তিনি কখনও প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। এক এক দিন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-মালায় তাঁহার বদন-চন্দ্রমা দগ্ধ তাম্র-ফলকের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে,—অনবরত ঘর্ম্ম নিঃসরণে পরিধেয় সিক্ত হইয়াছে, তথাপি একবার বহির্গত হইয়া শিকার লাভ না করিয়া সহজে ফিরিতেন না। রাজভোগ-পালিত দেহে এতই কাঠিন্য ও সহিষ্ণুতা ছিল!!

একদা আসাম অঞ্চলে শিকার করিতে যাইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের শ্যাম শোভন নিবিড় অরণ্য মধ্যে বিশাল-বপু-বিশিষ্ট ভীম-দর্শন এক নিদ্রিত শার্দ্দূল দর্শনে অতীব আনন্দোৎসাহের সহিত হস্তি-বেষ্টিত করিয়া নিঃশব্দে নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ শিকারিগণ, নিদ্রিতাবস্থায় কোন পশুর প্রতি গুলি চালনা করেন না,—তিনিও করিলেন না।

শার্দ্দূলপ্রবর জাগ্রত হইয়া যখন রক্তোৎপললাঞ্ছিত নেত্রযুগল বিঘূর্ণিত করিয়া শিকারিগণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখন তাহার সেই রোষকষায়িত আরক্তিম কুটিল কটাক্ষে অনেকেই সন্ত্রাসিত হইয়া অক্ষিগোলকের সম্মুখে রবিসুতের করাল ছায়াবলোকনে মুহুর্মুহু বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনেক খ্যাতনামা শিকারী উপস্থিত থাকা সত্বেও শার্দ্দূলপ্রবর অনায়াসে ঘূর্ণায়মাণ লাঙ্গূল দেখাইতে আরম্ভ করিল; কেহই বন্দুকোত্তোলনে সাহসী হইল না,—হস্ত শিথিল হইয়া আসিল,—সকলেই ম্লানমুখে দুই একবার মহারাজা বাহাদুরের দিকে সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শিকারলোলুপ সূর্য্যকান্ত, শিকার

দর্শন মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন; এখন অন্যান্যের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া অধিক উৎসাহিত হইলেন। শার্দ্দুলের নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্ত্তকাল অবসর না দিয়া বন্দুক ছাড়িলেন,—ভীমরবে অগ্ন্যুদ্গম করিয়া গুলি শার্দ্দূলের ভীম কলেবর বিদ্ধ করিল। শার্দ্দূল-প্রবর, অকস্মাৎ বজ্রপতনের ন্যায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্তে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভীম গর্জ্জনে বনস্থলী বিকম্পিত করিয়া,—শিকারীগণের প্রাণে বিষম ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়া, এক লম্ফে হস্তীর মস্তকারোহণ করিয়া বসিল। মাহুত বেচারার প্রাণ উড়িয়া গেল,—শিকারী সূর্য্যকান্তও নিশ্চিন্ত রহিলেন না।

এই সঙ্কট সময়ে প্রিয়ভৃত্য সনাতন, অসীম সাহসিকতা প্রদর্শনে প্রভুভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিল। সনাতন, মহারাজার অতি প্রিয়তম ভৃত্য ছিল,—শিকার কার্য্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। শিকার সময়ে হাওদার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পূর্ণ করাই ইহার কার্য্য। সনাতন এত ক্ষিপ্রতা সহকারে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিত যে, একমাত্র মহারাজা ব্যতীত অন্য কোন শিকারী তত তাড়াতাড়ী গুলি চালনা করিতে সমর্থ হইত না। উপস্থিত ক্ষেত্রে সনাতন দেখিল যে, অদ্যকার শিকার অতি ভয়ঙ্কর,—হয়, হস্তী মাহুত শূন্য হইবে, না হয় শিকারী শূন্য হইবে; শিকারী শূন্য হওয়ার আশঙ্কাই একটু অধিক। কেননা, ব্যাঘ্র-সমাগমে মাহুত বেচারা প্রাণভয়ে হস্তীর কর্ণাচ্ছাদনে স্বীয় গাত্র লুক্কাইত করায়, শার্দ্দূলপ্রবর সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া শিকারীর প্রতিই তীব্র কটাক্ষপাত করিতেছিল। ইত্যাকার দর্শনে মুহূর্ত্তের জন্য মহারাজাবাহাদুরও গুলি চালনায় ইতস্তত করিতে লাগিলেন। আর সময় নাই দেখিয়া প্রভুভক্ত সনাতন, প্রভুকে এই সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য অতি চতুরতার সহিত এমনভাবে মহারাজা

সনাতনের প্রভুভক্তি।

বাহাদুরের সম্মুখে "উপুড়" হইয়া পড়িল যে, ব্যাঘ্র আক্রমণ করিলে অগ্রে তাহাকে না নিয়া মহারাজাকে স্পর্শ করিতেও পারিবে না। ইত্যবসরে মুহূর্ত্তের অস্তিত্ব মুহূর্ত্তে মিশিতে না মিশিতেই শিকারপ্রবীণ সূর্য্যকান্ত ভগবানের মঙ্গলময় নাম স্মরণে হস্তোত্তোলন করিলেন,—গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইল,—সঙ্গে সঙ্গে শার্দ্দূলপ্রবর বিকট চীৎকার করিয়া "পপাত ধরণীতলে।" অমনি আবার গুলি, আবার আওয়াজ, উপর্য্যুপরি ৬।৭টী গুলিতে ব্যাঘ্র মহাশয় সাধের পশুলীলা সাঙ্গ করিলেন,—শিকারীগণও হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এই ক্ষেত্রে সনাতনের প্রভুভক্তি দর্শনে সকলেই বিমোহিত হইয়াছিল। সনাতন ভূয়সী প্রশংসার সহিত যে বিস্তর পুরস্কার লাভ না করিয়াছিল, তাহা নহে।

এইরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে সাহসী সূর্য্যকান্ত অভিজ্ঞতা বলে শিকার বিষয়ে যে ক্ষিপ্রতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, যদি তাহার বিন্দু মাত্রেরও অভাব হইত, তাহা হইলে, হায়, আসামের সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের নিবিড় কানন মধ্যে কি সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত,—বিষাদ-গীতি গাহিতে গাহিতে সমীর-প্রবাহ কোথায়,—কোন্ দূর দূরান্তরে মিশিয়া যাইত, তচ্চিন্তা একবারও তাঁহার নির্ভীক প্রাণে উদিত হয় নাই।

যাহা হউক শিকার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, ব্যাঘ্রটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাঁহার দীর্ঘ জীবন মধ্যে ঐরূপ প্রকাণ্ড-বপু-বিশিষ্ট ব্যাঘ্র অতি অল্পই শিকার করিয়াছেন। দেখিয়া প্রাণে বিস্তর আত্ম-প্রসাদ জন্মিল। উহার প্রকাণ্ড মস্তক এবং চর্ম্মটী বিশেষ যত্ন সহকারে রাখিয়া দিলেন। পরে ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে এই মস্তক ও চর্ম্ম সহকারে মহামান্য বড়লাট-পত্নী লেডী কার্জ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উহা তাঁহাকে প্রীতি-উপহার দিয়াছিলেন! বড়লাট বাহাদুর এবং

লেডী কার্জ্জনকে ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপঢৌকন প্রদান

তৎপত্নী এইরূপ সুন্দর ও সুবৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রাপ্তে বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।*

স্যার সিমুয়েল বেকার

স্যার সিমুয়েল বেকার সাহেব ইংলণ্ডের একজন সুবিখ্যাত শিকারী। তাহার মত সুদক্ষ এবং সুনিপুণ শিকারী সচরাচর দেখা যায় না। তিনি আমাদের মহারাজা বাহাদুরের সহিত শিকারে যাইয়া, তাঁহার শিকার-পারদর্শিতা দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এতদ্দেশে অদ্বিতীয় শিকারী বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রধান শিকারী

ভারতের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি স্যার জর্জ্জ হোয়াইট,—বঙ্গের প্রধান বিচারপতি স্যার কমার পেথ্রাম, এবং রুশিয়ার দুইজন খ্যাতনামা লর্ড, শিকারপ্রবীণ মহারাজা সূর্য্যকান্তের সহিত শিকারে যাইয়া তাঁহার শিকার-নৈপুণ্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন।

---

* বড়লাট পত্নী লেডী কার্জ্জন সুবৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রাপ্তে নিতান্ত প্রীতা হইয়া মহারাজা সূর্য্যকান্তকে ধন্যবাদ দিলে, তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রাইভেট।সেক্রেটারী ৮ই আগষ্ট (১৮৯৯) লিখিয়াছেন:—

Vicerigal lodge.
Simla,
8th August, 1899.

Dear Sir,

I am disired by Her Excellency Lady Curgon to thank you very much for your letter of the 5th instant and to say that She will have great pleasuie in accepting the tiger skin.

His Excellency desires melto congratulate you on the good sport you have had.

Yours faithfully

* * * *

Private Secretary to the Viceroy

১৯০২ খৃষ্টাব্দে মহামান্য গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর গৌড়-পরিভ্রমণ উপলক্ষে মহারাজা বাহাদুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। লর্ড বাহাদুর গৌড়ের নিবিড় অরণ্য মধ্যে আমাদের মহারাজা বাহাদুরের সহিত শিকারে গিয়া তাঁহার শিকার-কুশলতাবলোকনে বিস্তর সুখানুভব করিয়াছিলেন।

গৌড়ে বড়লাট

হস্তী, শিকারের প্রধান অবলম্বন। এতদ্ব্যতীত স্থল পথে শিকারের অন্য কোন সুবিধা নাই। শিকার-প্রিয় মহারাজা বাহাদুর, হৃদয়-নিহিত এই ব্যসনাশক্তির পরিতৃপ্তি সাধনোদ্দেশ্যে অনেকগুলি হস্তী পালন করিতেন। নিজের প্রাণাপেক্ষাও হস্তী তাহার অধিক প্রিয় ছিল। কোন হস্তীর কাতর সংবাদ পাইলে, তাঁহার প্রাণে এতই যাতনা বোধ হইত যে, উহার আরোগ্য সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত একরূপ উন্মাদ-গ্রস্তের ন্যায় ঘোরতর অশান্তির তীব্র তাড়না সহ্য করিতেন। 'জুলিয়া' এবং 'লিডিয়া' নাম্নী হস্তিনী-দ্বয়ের মৃত্যুতে তাহাদের সমাধি উপরে স্থাপিত স্মৃতি-স্তম্ভে লিখিত অতীব গভীর শোক-ব্যঞ্জক স্মারক-বাক্য পাঠ করিলেই তাঁহার হৃদয়-নিহিত অকৃত্রিম ভাল বাসার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।*

১। জুলিয়ার স্মৃতি-স্তম্ভে লিখিত আছে :—

(১)

"জন্মিলে মরিতে হয়, নিয়তির এ নিয়ম
খণ্ডিবার নয়।
অনন্ত কালের সীমা, করিবারে অতিক্রম
কে জনম লয়?

* মুক্তা গাছার বর্ত্তমান গো-হাটার মধ্যে সমাধি স্তম্ভদ্বয় পাশাপাশী ভাবে স্থাপিত। দাপুনিয়া, বেগুণবাড়ী এবং অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ সমাধি স্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু লোকে রসনায়, অন্তে যার গুণ গায়,
সেই ধন্য এ ধরায়, সফল তার (ই) জনম।

(২)

"জুলিয়ে কি শুভক্ষণে জনম লভিয়া ছিলে
তুমি এই ভবে।
প্রভুর আদরে এই পশু জন্ম কাটাইলে,
মরিলে গৌরবে।
হৃদে তোর স্মৃতি-স্তম্ভ দাঁড়া'য়ে করিছে দম্ভ,
বলত পশু-জীবনে এ সৌভাগ্য কার মিলে?

(৩)

"প্রাণ পণে রাজ-সেবা করিয়া সপিলা প্রাণ
কৃতান্তের করে,
রাজসিক সৎকারের চিহ্ন তব যে পাষাণ,
স্তম্ভের উপরে
রহিবে সে যত দিন মাটিতে নাহবে লীন
* * গাবে গৌরব সে ততদিন।"

২। লিডিয়ার স্মৃতি স্তম্ভে:—
"দানব মর্দ্দনে কালী মহাকাল প্রিয়া,
উল্লাস উন্মদা যথা ধায় রণস্থলে;
ধাইত যে মৃগয়ায় মহা কুতুহলে
আর এ সংসারে আহা! নাই সে লিডিয়া!

"কত শত শার্দ্দূল সে চরণে দলিয়া
বধিল পরাণে, যার করাল কবলে
হইত বিচূর্ণ বট-বিটপ সকলে
কাল-কবলিতা সেই নির্ভীকা লিডিয়া।

"চির তরে জীবনের খেলা ভঙ্গ দিয়া
অনন্ত নিদ্রায়, এই ভূমি খণ্ড তলে
অভিভূতা, অন্তিমের শয়নে লিডিয়া
আর কি জাগিবে সে ভবের কোলাহলে?
প্রভু ভক্তি পূর্ণ সদা ছিল যার হিয়া
লভিছে চির বিশ্রাম হেথা সে লিডিয়া।"

মহারাজা বাহাদুরের শিকার বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য বর্ত্তমানে যে সমস্ত দন্তি-যূথ বিদ্যমান, তন্মধ্যে 'এডিলা' এবং স্থানান্তর যাতায়াত জন্য 'ডাক সোয়ারীতে' 'ইভি' ও 'বনি' হস্তিনী দ্বয়ই, তাঁহার প্রাণের 'জুলিয়া' ও 'লিডিয়ার' নিদারুণ শোক গাঁথা বিস্মৃতির অন্ধ গহ্বরে প্রোথিত করিয়া হৃদয়ে কথঞ্চিৎ প্রীতি সঞ্চার করিতে সমর্থা হইত।

এডিলা, ইভি ও বনি হস্তিনী

'এডিলা' শিকার দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও ভীতা হইত না, বরং সুবিধা পাইলে পদ-দলনে বিনাশ করতঃ নিজেই শিকারীর স্থান অধিকার করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। হায়, 'এডিলা,' কোন্ প্রাণে তোমার প্রিয় প্রভুকে সংসার-সাগরের কাল-প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া এখনও স্থির ভাবে বিচরণ করিতেছ? কতবার কত শার্দ্দূলাক্রমণ হইতে রক্ষা করেছ, এই বার কি পারিলে না? ওহো! নিয়তি লিখন কি কঠিন!!!

ত্রয়োদশ সর্গ।

——:o:——

ধর্ম্ম ও সামাজিকতায়।

ধর্ম্ম, জীব মাত্রেরই প্রধান অবলম্বন। প্রত্যেক জীবেরই এক একটা ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার না করিলে কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না,—একথা কর্ম্মী সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে কর্ম্মময় জীবনের সূত্রপাত হইতেই প্রকটিত হইয়াছিল। যেমন কর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না,—তেমনই ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার না করিলে কর্ম্মের সাফল্য লাভ সুদুর-পরাহত।

সূর্য্যকান্ত ঘোর বিষয়ী হইয়াও আসক্তি শূন্য ছিলেন। অহর্নিশি বিপুল পরিশ্রম-সহযোগে কর্ত্তব্যের সাধনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভোগ-বিলাসে কিছুমাত্র প্রমত্ত ছিলেন না। সুতরাং ধর্ম্মরূপী বিবেক তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে বসিয়া প্রভূত প্রভাব-বৃদ্ধি করিবে, সন্দেহ কি?

আসক্তি-শূন্য মানুষই দেবতা সদৃশ। সংসার কর্ম্মক্ষেত্র,—কর্ম্মই এখানকার সাধনা; বিবেকের অনুমত্যনুসারে কর্ম্মের সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেই সাধনা করিতে করিতে যদি আসক্তির লীলা-ললিত মধুর ভাবহিল্লোলে প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে,—কর্ম্মের কঠোর বন্ধন যদি আসক্তির আবেশে শিথিল হইয়া পড়ে, তবেই বিপদ,—তখনই বিবেকের অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়,—তখন মানুষ ক্রমে মনুষ্যত্ব হারাইতে বসে। আসক্তি-বিহীন সূর্য্যকান্ত সে বিষয়ে নির্ম্মুক্ত ছিলেন।

কর্ম্মীর পক্ষে ন্যায় পথ অবলম্বনই প্রধান ধর্ম্ম। যে হৃদয়ে বিবেকের রাজত্ব আছে, সেখানে ন্যায়ের মর্য্যাদা সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়া থাকে। মহারাজা সূর্য্যকান্ত ন্যায়বান্ ছিলেন,—ন্যায়ের পবিত্রোজ্জ্বল দীপ্তি-রাজিতে তাঁহার হৃদয় আলোকিত ছিল। এ জন্য তাঁহাকে অনেক সময় কার্য্যক্ষেত্রে কঠোরতার পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ন্যায়ের রাজত্বে কঠোরতারই পূর্ণ বিকাশ। কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনায় কঠোর না হইতে পারিলে ন্যায়বান্ হওয়া যায় না। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গেলে, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এবং স্নেহ-মমতাদির মূলেও কুঠারাঘাত করিতে শিক্ষা করার প্রয়োজন। ন্যায়ের অনুরোধে এক সময় মিত্রকে পরম শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়,—আবার সময় বিশেষে পরম শত্রুকেও প্রীতি-সহযোগে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে হয়। এ পথে স্বার্থ, পরার্থ—উভয়ই তুল্য,—সুখ দুঃখ সমজ্ঞান। নতুবা বিবেকরূপী ধর্ম্মের আবির্ভাব সুদূর-পরাহত।

কঠোর হইলেও সূর্য্যকান্তের প্রাণে ভাব ছিল,—বিশ্বাস ছিল,—ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইত। ভাবই ধর্ম্মের ভিত্তি। তিনি আজীবন কর্ম্মের সাধনা করিয়া গিয়াছেন বটে,—কর্ম্মময় জীবনে প্রতিনিয়ত বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া মুহূর্ত্তকালও বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে পারেন নাই সত্য; কিন্তু সেই অবিশ্রান্ত কর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় একটু ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া প্রাণে যে ভাবের উৎস ঢালিয়া দিত, সে ভাব অনন্ত—অসীম—বিশ্বব্যাপী !! বিষয়-কর্ম্ম-ক্লিষ্ট সূর্য্যকান্ত পরিশ্রান্ত প্রাণে সে বিশ্বব্যাপী ভাব-হিল্লোলে আত্ম-বিহ্বল হইয়া হৃদয়ের প্রতি স্তরে অনন্তশক্তি ভগবানের ক্রিয়া উপলব্ধি করিয়া সুখী হইতেন।

সময় সময় এই ভাবের উৎস প্রকৃতির উন্মুক্ত গাত্রে ছড়াইয়া পড়িয়া কর্ম্ম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবচ্চিন্তা সম্মিলিত হইয়া কি পবিত্র

গঙ্গা যমুনার মধুর মিলন দেখাইয়া দিত! প্রকৃতি-জাত কুসুমের সুবিমল হাসিতে প্রেমময়ের উন্মুক্ত হাসির বিকাশ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রাণ কেমন নাচিয়া উঠিত!! একদা প্রস্ফুটিত কুসুম-দামের সৌন্দর্য্যাবলোকনে প্রকৃতির গায়ে সহাস্য-বদন ভগবানের হাসি জ্ঞান করতঃ মধুর ভাবে বিভোর হইয়া প্রাণের আবেগে কহিয়াছিলেন,—"বিধাতা বোধ হয়, নিঃস্বার্থ প্রেম ও দানের মর্ম্ম জগতে শিক্ষা দিবার মানসে এই ফুল ফলের সৃজন করিয়াছেন। এমন অকাতর, অযাচিত ভাবে দান,—এমন নিঃস্বার্থ প্রেম, প্রকৃতির মহাগ্রন্থে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হায়, পোড়া সংসার, প্রেমময়ের এই আদর্শ, এই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়াও কি তোমার চৈতন্য হয় না? এই বিরাট বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা, কি কেবলই স্বার্থ, আত্মসুখ এবং হিংসা-দ্বেষের বিষ-বহ্নিতে ভস্মীকৃত হইয়া পিশাচের রঙ্গস্থল হইয়া দাঁড়াইবে? যদি তাহাই হইল, তবে আর মহতে হীনে, ধনী দীনে, পার্থক্য কি? দীনের প্রতি ধনীর ঘৃণা ও নির্দ্দয়তা, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, পীড়িতের প্রতি সুস্থকায়ের নিপীড়ন প্রভৃতি লইয়া যদি সংসার হয়, কিম্বা ধন ও অভিমান যদি ধনীর গর্ব্বের বিষয় হয়, তবে এই সংসারের ত সবই—সং—সার; মূল কিছুই নাই। এই তুচ্ছ ভঙ্গুর জীবন লইয়া অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত করিলাম, তন্ন তন্ন করিয়া সংসার খুঁজিয়া বেড়াইলাম, পরার্থে প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, পরস্পরে সহানুভূতি প্রভৃতি কোথাও ত দেখিতে পাইলাম না। কেবল ছলনায়, প্রবঞ্চনায় জগৎ জড়িত। কপটতা, ঈর্ষাই কি আমাদের অঙ্গের ভূষণ!"* ভগবানে বিশ্বাস,—হৃদয়ে ভাবের বিকাশ, না থাকিলে কি স্বভাব-সৌন্দর্য্যাবলোকনে প্রাণ এরূপ আধ্যাত্মিক ভাব-হিল্লোলে নাচিয়া

---

* শিকার কাহিনী।

উঠে? হৃদয় পবিত্র না হইলে কি প্রাণে আত্মনিন্দার আবেগ জাগিতে পারে?

ভাব, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক—দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে আভ্যন্তরিক ভাবই প্রকৃত ভাব! মানুষের বাহ্যিক আবরণে যাহাই কেন থাকুক না, প্রাণে প্রাণে তন্ময়ত্ব থাকিলেই সব রহিল। মহাত্মা সূর্য্যকান্ত আভ্যন্তরিক ভাবই ধর্ম্ম-সাধনার ভিত্তি বলিয়া মনে করিতেন,—তাঁহার বিশ্বাস মত বাহ্যিক আড়ম্বর ছলনা মাত্র। ধর্ম্ম বিষয়ে মনের ভাব গোপন রাখিয়া আড়ম্বর বিহীন গুপ্ত-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই তাঁহার বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট! সমাজ তাহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার করুক, এভাব কখনই তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সিদ্ধি লাভের পূর্ব্বে সাধক বলিয়া অভিহিত হইতে মহাজনগণ প্রায়ই ইচ্ছা করেন না। ভণ্ডামীর মুখস্-পরিহিত পাপের অন্তর সাধকগণই পাপ-পঙ্কিল বাসনার সিদ্ধি-মানসে ঐরূপ ভাণ করিয়া থাকে। ভাব ব্যতীত ভাণে কোন ফল নাই। বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশ থাকিলে কি হইবে, ভিতরে সন্ন্যাস থাকা প্রয়োজন।

ভাবুক সূর্য্যকান্তের প্রাণে প্রাণে, মজ্জায় মজ্জায়, ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ—ভগবদ্ভক্তির পবিত্র ভাব, কিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার জীবন উন্নত করিয়াছিল,—সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতৃ পুরুষের চরণতলে কেমন বিশ্বস্তরূপে প্রাণ বাঁধা ছিল, তাহা তল্লিখিত নিম্নের সঙ্গীতটী সমালোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি প্রাণ খুলিয়া গাহিয়াছেন :—

বাগেশ্রী—আড়া।

"ভেবে দেখ মনে মনে রয়না কিছু চিরন্তনে ;
ধনৈশ্বর্য্য যত বল, সংসারের সুখ সম্বল,
হয় সে সব বিষের ফল, শেষের সে দিনে।

সংসারে দু'দিনের তরে, কর্ত্তা ব'লে সবে ডরে,
করিবে সে ভস্ম পরে, ফেলে শ্মশানে।
ভাব যারে আত্মজন, আত্ম সে নহে কথন,
সম্বন্ধ করে ছেদন, দুষ্ট শমনে।
খেদে বলে সূর্য্যকান্ত, মরিতে হবে নিতান্ত,
ভাবরে মানস ভ্রান্ত সে ভব কারণে॥

—কেবল তাহাই নহে; নিজ কৃত কর্ম্মের সমালোচনা দ্বারা সংসারের অসারত্ব বুঝাইয়া একমাত্র ঈশ্বর চিন্তায় প্রাণের উন্মত্ততা প্রতিফলিত করতঃ কেমন উদাস প্রাণে গাহিয়াছেন :—

(রাজমোহন আম্বলীর সুর)

"রে মন ভবে এসে কি করিলি ?
মিছে বিষয় খেলাতে কাল কাটালি॥
কেবল কড়ি আন্‌লি, কড়ি গণ্‌লি,
কড়ির ভাবনা ভাবিলি, কড়ির অঙ্ক কতই কসিলি।
মনরে তুই পরের বেলায়, হিসাব কল্লি কড়ায় গণ্ডায়,
নিজের বেলায়, ঠিক স নামালি॥
দালান কোঠা ঘর বাড়ী, বাড়াইলি জমিদারী,
আয়ের উপায় সদাই চিন্তিলি।
বাড়িল বটে পাপের আয়, এদিকে তোর দিন যায়,
অর্থ চিন্তায় অনর্থ ঘটালি॥
পুনঃ পুনঃ রশি ধরি, জরিপ করি প্রজাওয়ারী,
প্রজার অর্থ কৌশলে হরিলি;
নিরীখ বৃদ্ধি করে, পরে আয় দেখিলি জমার ঘরে,
পুণ্যের ঘরে শূন্য বসালি॥

পরের স্বত্ব নাশের তরে, আনি উকিল ব্যারিষ্টারে,
মোকদ্দমা কতই ছাঁদ্‌লি।
আপন স্বত্ব হবে লুপ্ত, প্লিড্ করবেন চিত্রগুপ্ত,
জাননা সে কোন্ কোর্টের কৌনসলি॥
উচ্চ পলিসির বলে, ভবে গণ্য মান্য হলে,
রাজা রায় উপাধি ধরিলি।
শমন এসে ধরবে যখন, ছাড়তে হবে ঐশ্বর্য্যধন,
ছায়াবাজি ঘুচিবে সকলি॥
এই ব্যাপারে কিলাভ হবে, শূন্যহাতে যেতে হবে,
তুই মৃগতৃষ্ণায় রলি ভুলি।
যে শরীরের এত যতন, হবেরে তার শীঘ্র পতন,
সূর্য্যকান্তের শরীর হবে ধূলি॥

মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছলচাতুরী প্রভৃতি ধর্ম্ম বিগর্হিত ব্যবহারে তাঁহার নিতান্তই ঘৃণা ছিল। একটী পাপ কার্য্য গোপন করিতে গিয়া অপর একটী পাপের অনুষ্ঠান করা, তাঁহার মতবিরুদ্ধ। তিনি জানিতেন, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বশতঃ যে পাপাঙ্কে মস্তক অবনত করা যায়, সত্যের অপলাপ দ্বারা জন সমাজের চোখে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টায় তাহার কোনই প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই; সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বদর্শী ভগবানের চোখে ধূলি দিতে পারিলে কতকটা রক্ষা বটে! কিন্তু তাহা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং জলে জলবৃদ্ধির ন্যায় পাপে পাপার্জ্জন করিয়া লাভ কি?

সমাজ, ধর্ম্মশিক্ষার একটী প্রধান স্থান। সমাজের রীতি নীতি অনুসারে মানুষের মতি গতি গঠিত হইয়া থাকে। যে সমাজে ন্যায়ের মর্য্যাদা সর্ব্ব বিষয়ে রক্ষিত হয়,—স্বার্থের প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত যে স্থানে প্রবাহিত হয় না, সে সমাজকে দেবসমাজ বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না,—সেখানে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকাশ পায়,—নীতি শিক্ষার অনেক বিষয় বর্ত্তমান থাকে; সে সমাজের কার্য্য কলাপে দেশের সমূহ উপকার সংসাধিত হয়। সুতরাং সংসারীর পক্ষে সমাজ বন্ধন অতীব আবশ্যকীয়। কিন্তু হায়, সমাজের সেই সুদৃঢ় বন্ধন রজ্জুতে সর্ব্বানিষ্টকারী স্বার্থ-কীট প্রবেশ করিয়া রজ্জু গাছি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনও শিথিল হইয়া আসিয়াছে! নাই বা হইবে কেন? যেখানে বসিয়া আচার ব্যবহারাদি শিক্ষা দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠিত হইবার কথা,—যে স্থান নীতি-শিক্ষার আদর্শ স্থল, তথায় যদি নিরপেক্ষ ভাবের পরিবর্ত্তে কেবল বৈর নির্য্যাতনই প্রধান লক্ষ্য হয়,—সহৃদয়তার বিনিময়ে যদি হিংসার প্রবল বহ্নিতে কেবল দুর্ব্বলের অস্থি মজ্জাই ভস্মীভূত হইতে থাকে, তাহা হইলে সেখানে একত্ব কি করিয়া জন্মিতে পারে? কাজেই মতান্তর ঘটিতে ঘটিতে ক্রমে বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে। এই সমাজের বুকে বসিয়া কতজন কত উপায়ে জঘন্যতা পূর্ণ শত সহস্র পাপের অনুষ্ঠান দ্বারা নরকের কীট হইতেও জঘন্যতার পরিচয় দিতেছে; আবার সেই সমস্ত পিশাচ-রূপী নরগণই ধার্ম্মিকের মুখস্ পরিয়া ধর্ম্মের পূর্ণ অবতার রূপে সমাজে আত্ম পরিচয় দিতেছে! কেবল, তাহাই নহে,—এই সমাজের দোহাই দিয়া কত হিংসাপরায়ণ স্বার্থপর, দুর্ব্বলের প্রতি অযথা পীড়ন দ্বারা স্বীয় হিংসা বৃত্তির পুষ্টি সাধন করিয়া লইতেছে। এ অবস্থায় এমন স্বার্থপর সমাজের মাথায় বাজ পড়িবে না কেন? যে সমাজে স্বার্থ সাধন জন্য অযথা দলাদলি বিদ্যমান, সে সমাজের উন্নতি আশা কিরূপে করা যায়? এরূপ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, একজনকে প্রতিভাবলে উন্নতি সোপানে আরূঢ় দেখিলে, অমনি অন্যজন তাহার উন্নতিতে স্বীয় উন্নতি বা প্রভুত্ব নাশের আশঙ্কা করিয়া নানা উপায়ে তাহার উন্নতিতে বাধা দিয়া থাকে;—কেহ

কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। বর্ত্তমান সমাজের কাজই আত্ম-মহিমা প্রবল রাখা। সুতরাং সমাজ উন্নত হইবে কেমন করিয়া? সমাজ উন্নত না হইলে লোকের মানসিক বৃত্তি সংশোধিত হইতে পারে না,—প্রাণে প্রাণে জাতীয় মধুর ভাবের স্রোতও প্রবাহিত হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি সুদূর-পরাহত!! কেবল আত্মমতে সমাজ পরিচালিত হয় না, সর্ব্বসাধারণের মতের প্রয়োজন। এই ত সমাজের অবস্থা! এ সমাজের চোখে ধূলি নিক্ষেপ অতীব সহজ-সাধ্য;—কিন্তু ধর্ম্মের নিকট সহজ নহে। মানুষ যাহা কিছু করে, সমাজ না দেখিলেও, ধর্ম্ম তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তাই সূর্য্যকান্ত, কোন বিষয়েই সমাজের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। জীবনে কখনও কোন কার্য্যে প্রতারণার ধার ধারেন নাই। পলিসি (policy) খাটাইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রতারক ছিলেন না।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীত কয়টীর সমালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, তিনি একজন শক্তি-সেবক ছিলেন,—এ জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কিছুই নহে,—সংসার, অসার কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র,—মায়ের চরণই যথা সর্ব্বস্ব!! তাঁহার জ্ঞানময় হৃদয় ভগবচ্চরণে কিরূপ সংবদ্ধ ছিল,—ধর্ম্মে তাঁহার কতদূর অটল বিশ্বাস ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। যাহার প্রাণে ভাব নাই,—ভক্তি নাই,—বিশ্বাসের কণিকা মাত্রও যে হৃদয়ে স্থান পায় না, সে প্রাণ কি মায়ের চরণ আশায় এত উদ্বিগ্ন হইতে পারে? নাস্তিকের প্রাণে কি ভগবদ্ভক্তি স্রোত প্রবাহিত হইয়া এরূপ তন্ময়ত্ব আসিতে পারে?

মহাত্মা সূর্য্যকান্ত, ভক্তি-গদ্‌গদ হৃদয়ে প্রাণের গুপ্তোদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে গিয়া কিরূপ মধুর তানে গাহিয়াছেন :—

ভৈরো—ঠুংরী।

"জয় রঘুনন্দন, ভব ভয় ভঞ্জন,
জগদীশ, মনীষ মহেশ হে।
তুমি ভব কারণ, তুমি ভব তারণ,
সারণ-বারণ-কারণ হে ॥
তুমি জ্যোতির্ম্ময়, জগত আশ্রয়,
ভকত জীবন, দীন-শরণ হে।
অরুণ উদিল, ভুবন উজিল,
হাসিল, ভাসিল, অতুল প্রেম হে ॥
যে দিকে ফিরে নয়ন, হেরি তব প্রেমানন,
প্রকৃতি আকৃতি তুমি পাপহারী হে।
এই উষাকালে, ভক্তি-ফুল তুলে,
সূর্য্যকান্তে, পদপ্রান্তে দিবে হে ॥"

বাগেশ্রী—ঠেকা।

"আশার কুহকে পড়ি ঘুরিতেছি অনুক্ষণ।
দেশ বিদেশে বেড়াই, খুঁজি আমি নাহি পাই,
তবু আমি তারে চাই, যে হবে মোর প্রাণের প্রাণ ॥
হৃদয় শ্মশান সমান, শান্তি নাহি পায় স্থান,
ডাকিলে তোমারে মাগো, আন্ধারে আলো তখন ;
স্মরিলে মহিমা তোমার, দূরে যায় হিংসা অহঙ্কার,
ছোট বড় নাহি বিচার, আনন্দে ভাসি তখন।
তব চিন্তায় দিবানিশি, আনন্দ তরঙ্গে ভাসি,
তবু সূর্য্যকান্ত দোষী, বল কি কারণ ॥"

(রামপ্রসাদী সুর)

"নিবিল আমার সুখের দশা,
এখন ঘিরিল আসি দশম দশা ॥
সুখে দুঃখে কাল কাটাব ছিল মনে বড় আশা,
পূর্ণ হতে দিল না মা, ঘরে যত কর্ম্ম-নাশা।
সূর্য্যকান্ত এই বলে মা, সুখ নাই মোর একমাষা,
ওগো ভেঙ্গেছে মোর আশার বাসা, এখন কেবল দুর্দ্দশা ॥"

(রামপ্রসাদী সুর)

"হয়েছে মোর শমন জারী,
পাক্‌ল রে মোর গোঁপদাড়ি ॥
পাপী বলে দৌড়ায় মোরে মা, দৌড়িতে আর নাহি পারি;
লুকাইবার স্থান দেখিনা মা, বিনে তোমার চরণ তরী ॥
শমনের পর ওয়ারেণ্ট দিবে, পরে মাল ক্রোক হবে,
নাজির মাল বাহির করে, ডাকিয়ে মার্‌বে হাতুড়ী ॥
ইহাতেও না পেলে হাজির, হুলিয়া করিবে বাহির,
হেণ্ড্‌কফ দিয়ে নিয়ে যাবে ক'রে মোরে গিরিপ্তারী।
যা হবার হয়েছে মা, ওগো হর-মনোরমা,
রেখো সূর্য্যকান্তে, পদপ্রান্তে, বাজবে যখন শেষের ঘড়ি ॥"

"দিন গেল গেল দিন কেমনে হব পার।
গত অপরাধ যত ক্ষমাচাই হয়ে নত,
আর কত দুঃখ দিবে, মাগো সহিতে না পারি আর।
সৎসঙ্গে না হ'য়ে রত, পাপ কর্‌লেম কত শত,
না চিনিলাম তোমায় মাগো, করি সদা অহঙ্কার ॥
তুমি দয়া স্বরূপিণী, তাহাত আমি গো জানি,
স্বগুণে তরিতে মাগো দেখি পার কি না পার ॥"

ভগবান্ কহিয়াছেন, যে সমস্ত মহাত্মা জগদীশ্বরের সাধনা করিতে করিতে বাসনার সুমন্দ-মরুত-হিল্লোলে ঈষদ্বিচলিত হইবেন, তাঁহারাই নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধনায় ভ্রষ্ট হইয়া সংসার ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করতঃ কর্ম্মের সাধনা দ্বারা বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। * এইরূপে কর্ম্মের সমাপ্তি হইলেই মুক্তিলাভ ঘটে। সুতরাং যাহারা ভগবানের এত অনুগৃহীত, তাহাদের প্রাণ, বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক যে কোনরূপে ধর্ম্মের শুভ্র-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে না কেন? তাই ভক্তি-প্রবণ সূর্য্যকান্তের বিশ্বস্ত হৃদয়ে সাধকের সারযুক্তি—

"দুখ পাওয়েতো হরি ভজে,
সুখে না ভজে কোই,
সুখমে যো হরি ভজে,
দুখ কাহাসে হোই"
(তুলসী)

—কথা কয়টীর মর্ম্মার্থ মন্দাকিনীর সুস্নিগ্ধ সলিলধারার ন্যায় পীযূষ-পূরিত শান্তি-ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, "যিনি কেন মনে যাহা না ভাবুন, কি বলুন, তিনি সর্ব্বথারূপে বলিতে বাধ্য, ভগবান যেরূপ ভাবেরই জিনিষ হউন না কেন, একটা কিছু আছেন! তাঁহার অসীম অনন্ত শক্তি জগৎব্যাপী। বিপদে পড়িয়া তাঁহার আশ্রয় লইলে, কাতরে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি কোনরূপেই আশ্রিতকে চরণে ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন না, অলক্ষ্যে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার

---

* শ্রীভগবানুবাচ ঃ—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ-ভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥
গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

স্নেহের অঙ্কে টানিয়া লয়েন। তখন ভগবানের কৃপার উন্মেষ দৃষ্টিগোচর হয়!" *

ধর্ম্মচিন্তা নিভৃতে বসিয়া করাই তাঁহার যুক্তিসিদ্ধ ছিল। ভগবচ্চিন্তা—ভগবদ্ভক্তি, হৃদয়ের অতি গুহ্যতম প্রদেশে লুক্কায়িত রাখিয়া গুপ্ত সাধনায় বিস্তর আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেন;—হৃদয়ের ভাব অপরকে বিন্দুমাত্রও জানিতে অবসর দিতেন না। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে শুদ্ধচিত্তে নিভৃতে বসিয়া "দুর্গা" নাম লিখিতেন। উহা না লিখিয়া অন্য কোন কাজে হাত দিতেন না। তাঁহার এই ভক্তি-তত্ত্ব অনেকেই অবগত নহেন। প্রাণে ভক্তির সঞ্চার না হইলে কি বিষয়-ক্লিষ্ট হৃদয়েও নিয়ম মত "দুর্গা" নাম লিখিতে সাধ যায়?

তিনি বিষয়ী,—বিষয়ের স্তরে স্তরে তাঁহার প্রাণ নিবিষ্ট ছিল। দিবানিশি বিষয়ের গোলযোগে থাকিয়াও ঈশ্বর চিন্তা ভুলিতে পারেন নাই। প্রভূত উৎসাহ সহকারে বিষয়-সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে ভগবচ্চিন্তার ন্যায় শান্তি-সুধা লাভ করিতে পারেন নাই। ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত শান্তিলাভ অসম্ভব। তাই অতি দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছেন,—"রাজা হউক, প্রজা হউক, সুখ প্রায় কাহারও অদৃষ্টে নাই। এই বহির্জ্জগতের সুখ, সুখ নহে, ও কেবল একটা ক্ষণিক কল্পনার বিদ্যুৎস্ফুরণ মাত্র। আমিও দৃঢ় বুঝি, সুখ থাকে ত আছে, এক সেই ভগবানের আরধনায়, সংসার-আবল্য ত্যাগ করিয়া যদি মনকে নিয়োজিত করা যায়, তাহাতে। এই জন-কোলাহল-পূরিত ভবেরহাটে আর কোথাও সুখ নাই,—আর কোথাও শান্তি নাই। দুঃখের বাজারে ধনী, দীন, সবল, দুর্ব্বল সকলেই আমরা কম হইয়া মোহের পশরা মাথায় লইয়া বাসনার দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" †

* প্রবাসে শিকার কাহিনী।

† প্রভৃতিশিকার কাহিনী।

সূক্ষ্মদর্শী সূর্য্যকান্তের অবিচলিত হৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশে ফল্গু-প্রবাহের ন্যায় একদিকে যেমন ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্থিরভাবে থাকিয়া প্রাণে অসীম আনন্দধারা প্রবাহিত হইতেছিল,—পক্ষান্তরে সমাজের মলিন মুখাবলোকনে তেমনই ম্রিয়মাণ ছিলেন। দিন দিন দেশের যেরূপ অবস্থান্তর ঘটিতেছে,—সময়-চক্র যেরূপ মুহুর্মুহু বিভিন্ন পথে আবর্ত্তিত হইতেছে এবং তৎফল-ভোগী মানুষের মানসিক গতি যেরূপভাবে নিত্য নূতন পথে ধাবিতা হইতেছে, তাহাতে সমাজের দুরবস্থা ঘটিবে, সন্দেহ কি? সংসারাভিজ্ঞ সূর্য্যকান্ত, সংসারের ভাবগতিক উপলব্ধি করিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় সমাজ গঠিত না হইলে দেশের মঙ্গল কিছুতেই হইবে না; বরং দিন দিন তিল তিল করিয়া ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইবে। পূর্ব্বে যে সমস্ত নিয়ম প্রণালী সমাজের হিতকর বলিয়া পরিগৃহীত হইত,—যাহার অনুসরণে মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ আত্মসম্মান লাভে অগ্রসর হইত, সময়ের পরিবর্ত্তনে তাঁহারও বিশেষ পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক,—নতুবা মঙ্গলাশা চপলা-বিকাশের ন্যায় চঞ্চলা। সমাজের উন্নতির উপর দেশের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে।

শিক্ষা, সমাজের প্রাণ! শিক্ষা না থাকিলে অবিদ্যা প্রভাবে সমাজ এত দিন উৎসন্ন যাইত। সময়ের যেরূপ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষার আবশ্যক। বর্ত্তমানে দেশের অবস্থানুসারে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইতে বাসনা থাকিলে লণ্ডন প্রভৃতি দূরদেশে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সুতরাং শিক্ষাভিলাষী যুবক সম্প্রদায় বাধ্য হইয়াই জাত্যাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া আমেরিকা লণ্ডন প্রভৃতি দূরদেশে গমন করিতেছে এবং একমাত্র তাহাদেরই প্র জ্ঞানালোকে দেশের অনেক- গুপ্তরত্ন লোক সমাজে প্রতি হইতেছে।

অতি প্রাচীনকালে রত্নগর্ভা ভারতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত যে সমস্ত রত্ন বিদ্যমান থাকিয়া বৈদেশিকের চোখে ঈর্ষার উষ্ণ প্রস্রবণ ঢালিয়া দিত, ব্যবহার দোষে মধ্যযুগে তাহার কিছুই ছিল না,—বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র সমূহ বিস্মৃতির গভীর গহ্বরে প্রোথিত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার অধীন হইয়া পড়ে। সুতরাং সে সমস্ত রত্নের উদ্ধার সাধন করিতে হইলে শিক্ষার জন্য লণ্ডনাদি ভিন্ন দেশে যাইতে হয়। যে সমস্ত মহাত্মা দেশের অভাব বুঝিয়া,—একমাত্র জাতীয় উন্নতির আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, প্রভূত শ্রম সহকারে লবণ-সমুদ্র লঙ্ঘন দ্বারা জ্ঞান সমুদ্র মন্থনে লুপ্তরত্নের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, যাঁহারা দেশের উন্নতি সাধনে দেহের শোণিত, জল করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, কালের ধর্ম্মানুসারে কঠোর সমাজ-শাসনে আজ তাঁহারা সম্পূর্ণ পৃথক,—নিজের বন্ধু-বান্ধবের সহিতও মিশিতে পারিতেছেন না। কোথায় দেশের উন্নতি, জাতীয় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, শেষে কিনা নিজকে নিয়াই বিব্রত !! বরাহ-পিশিতাশী অজ্ঞ ইতর সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মে স্থান লাভ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সমস্ত জ্ঞানোজ্জ্বল রত্নের স্থান হইতে পারে না ! এই ত বিচার !! ইহাতে দেশ উৎসন্নের পথে যাইবে না কেন ?

কেবল তাহাই নহে ; হিন্দু সমাজে এখনও কন্যাপণ, বরপণ, প্রভৃতি কতকগুলি কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত থাকায় সমাজের বিশেষ অনিষ্টসাধন হইতেছে। এই অভিনব অর্থ-শোষণ প্রণালীর বিষ-ক্রিয়া দ্বারা সমাজের অস্থিমজ্জা বিশুষ্ক হইতে হইতে এখন উহা ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর নব শাখান্তর্গত হিন্দু সম্প্রদায় প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিয়াছে। আর কিছুদিন এরূপ ভাবে শোষিত হইলে অনায়াসে উহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যাইবে। রজক, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের কত হতভাগ্য কন্যাপণের দারুণ

কশাঘাতে বিবাহ-বিষয়ে হতাশ হইয়া আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক অনায়াসে স্বীয় জাতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে! পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বরের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে গিয়া এত সন্ত্রাসিত হইয়াছেন যে, এখন কাহারও ঘরে কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলে, তাহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে;—পবিত্র অপত্য-স্নেহের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার প্রাণে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। কত নিঃস্ব হতভাগ্য, অর্থাভাবে পূর্ণবয়স্কা আইবুড় কন্যা ঘরে রাখিয়া প্রতিনিয়ত অশ্রুজলে বক্ষঃ প্লাবিত করিতেছে,—কত যুবতি, অভাবে পড়িয়া লালসার লীলা-ললিত ভাব-স্রোতে কাণ্ডারী-বিহীন যৌবনতরী ভাসাইয়া দিয়া অধর্ম্মের ধ্বজা উড্ডীয়মান করতঃ নরকের বীভৎস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করাইতেছে!!

সর্ব্বোপরি কৌলীন্য প্রথা,—কুলীন কুমারীগণের দারুণ অভিসম্পাত! সে মর্ম্ম বিদারক দারুণ অভিশাপে সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইবে,—সংসার শ্মশানে পরিণত হইবে। কিন্তু কৈ? সমাজ ত একবারও সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না? এখনও অশীতি-বর্ষীয়া লোলচর্ম্ম-বিশিষ্টা আইবুড় কুলীন-কুমারী, সমাজে নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া অষ্টমবর্ষীয় বালকের গলদেশে পিশি, ভগ্নী, মাসী একত্রে বরমাল্য দান করিতেছে;—এখনও সমাজের বক্ষে বসিয়া রাশি রাশি ভ্রূণহত্যা হইতেছে;—এখনও ষোড়শী যুবতি কন্যা নবমবর্ষীয় কুলীন বালকের সহিত পরিণীতা করিতে পারিলে অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ জীবন সার্থক মনে করেন!! ইহাতে পাপের উষ্ণ প্রস্রবণে ঝাঁপ দিয়া আজীবন কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইতে কি পিতা মাতাই কন্যার প্রতি ইঙ্গিত প্রদর্শন করেন না? পাপের সংসার কয়দিন থাকে? হিন্দু সমাজের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। যে হিন্দু-সমাজ একদিন জগতে অতুল ছিল,— যে হিন্দুগণ একদিন ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি তপঃ প্রভাবে সুরপতি সহস্রাক্ষকেও

অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন,—যে জাতি সংসার ধর্ম্ম যথারীতি রক্ষা করিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ ছিল,—হায়, সেই দেব-পূজ্য হিন্দু-সমাজের আজ কি দুর্গতি! সেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আজ কি বিসদৃশ অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত!! কালের পরিবর্ত্তনই কি ইহার মূল নহে।

দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় সমাজ যদি আজও সে গুরুতর অভাব অভিযোগের কথা না বুঝিতে পারে তাহা হইলে আর মঙ্গলাশা নাই। জাতীয় ভাব জাগ্রত করিতে আমরা ব্যগ্র হইয়াছি বটে, কিন্তু নিদ্রিত সমাজের চৈতন্যোদয় করিতে না পারিলে মুখের ভাব মুখেই থাকিয়া যাইবে,—হৃদয় পর্য্যন্ত পৌছিতে সমর্থ হইবে না। যে সমস্ত বিসদৃশ ব্যাপারে সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে,—যে সকল অভাবে পড়িয়া সমাজ ক্রমে জনশূন্য শ্মশানাকারে পরিণত হইতেছে, কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সে সমস্ত অভাব দূরীভূত না হইলে সমাজের মঙ্গলাশা শিবা-শৃঙ্গ-সদৃশ।

মহামতি সূর্য্যকান্ত, সমাজের গুরুতর দৌর্ব্বল্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াই সময়-স্রোতে গা' ঢালিয়া দিয়াছিলেন,—সমাজের অশ্রু-সিক্ত মলিন মুখাবলোকনে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল বলিয়াই, পূর্ব্ববঙ্গে গুরুতর ভাবে সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একা;—একার শক্তিতে এতবড় একটা গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি তাহার ক্ষুদ্র শক্তি টুকুর পরিচালনা দ্বারা আদর্শ স্থানীয় হইতে যত্নের ক্রটী করেন নাই।

সমাজ এবং জাতীয় উন্নতির পথে সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত মতভেদ যে, একটা গুরুতর অন্তরায় তদ্বিষয়ে ভারত-হিতৈষী মিঃ হিউম সাহেব জাতীয় মহা সমিতির ১৯শ অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবাসীকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন:—" * * * তোমাদের উন্নতি

তোমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা সমস্ত সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগত মতভেদ বিস্মৃত হও, পরস্পরকে বিশ্বাস কর, ভণ্ডামী ও কপটতা পরিত্যাগ কর, সকলে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, রাত্রিদিন ভুলিয়া একমনে, এক ধ্যানে উদ্দেশ্য-সাধন-পথে অগ্রসর হও, অবিচলিত, অক্ষুব্ধ ও অসন্দিগ্ধ-চিত্তে কার্য্যে ব্যাপৃত হও; দেখিবে তোমাদিগের কামনা পূর্ণ হইবে।"*

সামাজিকতা, দেশের কার্য্যে বিস্তর শক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভারতে যদি বিভিন্ন সম্প্রদায় বা মতভেদ না থাকিয়া সকলেই এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিত, তাহা হইলে যে, দেশের বিস্তর উপকার সাধিত হইত, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। †

'বিলাত ফেরতা' বলিয়া যদি উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া যায়,—তাহারা নিজদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও যদি তেমন সাদর-সম্ভাষণ-সহযোগে নিজ গৃহে সমাদৃত হইতে না পারেন, তাহা হইলে, হিন্দু-সমাজ ক্রমে ক্রমে মনুষ্য-শূন্য হইয়া নিরক্ষর গুটীকতক লোক লইয়া কুসংস্কারান্ধকারে মস্তক-বিহীন "ব্রহ্মদৈত্য" রূপে লোক সমাজে ভীতি প্রদর্শন করিবে মাত্র! স্থিতির ব্যাপকতা কিছুই থাকিবে না; যাঁহারা দেশের জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে বিপুল পরিশ্রম করতঃ জ্ঞান-ভাণ্ডার আনিয়া স্বদেশকে লক্ষ্মীর-ভাণ্ডার সাজাইতে যত্নপর,

---

* শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর কৃত 'দেশের কথা।'

† এ সম্বন্ধে মাননীয় বিচারপতি চন্দাবর রায় মহোদয় গত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের সামাজিক সমিতির অধিবেশনে বলিয়াছিলেন:—It is a superficial veiw to take of the cause of the degeneracy of a community of people to say that it has gone down solely because it is devided into innumerable castes, it enforces infant-marriage it prohibits widow marriage and keeps women in seclusion." দেশের কথা।

তাঁহারা যদি দেশে আসিয়া এরূপ ভাবে অনাদৃতাবস্থায় থাকিতে বাধ্য হন,—স্বজাতির জন্য চুরি করিয়া যদি শেষে স্বজাতীয় কর্ত্তৃকই চোররূপে ধৃত হন, তাহা হইলে, তাঁহাদের প্রাণে উৎসাহই বা থাকিবে কিসে,—আর জাতিগত জীবন্ত ভাবই বা প্রকাশ পাইবে কি প্রকারে? জানি না, সমাজ ইহাঁদের প্রতি এত খড়্গ-হস্ত কেন? সময়ে কিছুই থাকিবে না, দু'দিনের ছাড়াছাড়ি মাত্র।

সময়, এখনই সে সকল বিষয়ে কুটিল কটাক্ষ ক্ষেপণে নিজের শক্তি-বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছে। সময়ের পরিবর্ত্তনে মানুষের মানসিক ভাব বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সমাজ এখন মিশা-মিশিই ভালবাসে। জাতিগত বিভিন্নতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে যাহার ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান না করিয়া উপায়ান্তর ছিল না, এখন তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেও তত ক্ষতির কারণ হয় না। "ভ্রাণেন সার্দ্ধ ভোজনম্"—এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বে যে সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, এখন অশনেও তাহার একাংশ মাত্র অনুষ্ঠিত হয় কি? পূর্ব্বে আমরা বিলাত-গমন, যে চোখে দেখিতাম, এখন ঠিক সেই ভাবেই অবলোকন করি কি? বিধবাগণকে পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বংশ-বৃদ্ধি দ্বারা জাতীয় কল্যাণ সাধনে যখন কাহারও কাহারও চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছে, তখন সময়ের পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

দূরদর্শী সূর্য্যকান্ত, সময়ের পরিবর্ত্তন,—সমাজের অভাব,—জাতীয় জীবনের শিথিলতা ইত্যাদি বিষয় সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতে সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করতঃ দেশের উন্নতি মানসে সমাজের একটী গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন। তাহার ন্যায় অগ্রণী-গণ যদি এ কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহা হইলে অপর, দশজনে, তাহাদের অনুকরণ করিবে বিবেচনায় ১৯০৪ খৃঃ অব্দে (১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ই ভাদ্র

সোমবার) সুযোগ্য বারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুরূপা কন্যা লীলা দেবীর সহিত স্বীয় পুত্র কুমার শশীকান্তকে শুভ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে এমন সামাজিক ব্যাপারে আদর্শ স্থল হইলেন।

শশীকান্তের শুভ পরিণয়।

লীলাদেবী

তাহার এই আকস্মিক আত্মদানে দেশে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল,—সমাজে একটা বিষম বিপ্লব ঘটিয়া উঠিল,—অনেকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নানারূপ অলীক প্রসঙ্গের সৃষ্টি করিল,—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন বলিয়া নিজেও স্বীয় সমাজে একটু হেয় হইলেন; কিন্তু স্থিরহৃদয় সূর্য্যকান্ত এক তিলও বিচলিত হয়েন নাই,—বরং আত্মীয় স্বজনের কটুক্তির প্রতি বিন্দু মাত্রও লক্ষ্য না করিয়া প্রভূত ধৈর্য্য সহকারে ধীর-পাদ-বিক্ষেপে বীরের ন্যায় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। দেশের জন্য তাঁহার প্রাণ উন্মত্ত,—দেশের উন্নতি-সাধন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য; সুতরাং তিনি আশুবিসদৃশ কার্য্যে বিচলিত হইয়া ভবিষ্যৎ-গর্ভ-নিহিত স্থায়ী সুফল বিনষ্ট করিবেন কেন? সময়ের যেরূপ ঘোর পরিবর্ত্তন, হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তানুসারে অপর দশ জন এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইবে এবং তাহাতে ক্রমে দেশের একটী অমঙ্গল জনক কার্য্যের মূলোৎপাটিত হইয়া হিন্দুগণ সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ভুলিয়া একসূত্র গ্রথিত জাতীয় জীবন লাভ করতঃ উন্নতির শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে পারে। সময়ের আবর্ত্তনের কিছুই অবিশ্বাস্য নহে। কালে যদি তাহাই হয়, তবে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, মনস্বী সূর্য্যকান্তের এই দূরদর্শিতার ফল কত সুখকর,—তখন তিনি সমাজের কত উচ্চ স্থানে স্থান লাভ করিবেন!!

বিবাহের পর মাঘ মাসে মহারাজা বাহাদুর, পুত্র এবং পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া ময়মনসিংহ সহরে শুভাগমন করিলেন এবং সহরে বিস্তর

আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করিয়া সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

শশীকান্তের বিবাহোৎসব

এই উৎসব উপলক্ষে সহরে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত জমিদার, তালুকদার, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আহার্য্য দ্রব্যের উপঢৌকন দ্বারা যথা স্থানে সমাদৃত হইয়াছিলেন। সমাগত কাঙ্গালিগণ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার এবং নব বস্ত্র প্রাপ্তে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিল। এই সময় সহরের সর্ব্বস্থান নীল-পীত-লোহিতাদি বর্ণ-রঞ্জিত পতাকাদিতে শোভিত হইয়া এবং সুন্দর ইলেকট্রীক দীপ-মালা-বিভূষিত হইয়া এ মর জগতে অমরাবতীর প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছিল। কলিকাতা হইতে সমাগত নাটকাদি আমোদ প্রমোদে সমাগত জন-মণ্ডলীর প্রাণে অননুভূত-পূর্ব্ব আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সে আনন্দ, অপূর্ব্ব—অনির্ব্বচনীয়!! দেশের কার্য্যে এ সামাজিক বন্ধন, পূর্ব্ববঙ্গে আদর্শ স্বরূপ পরিগণিত হইয়া দেশের মঙ্গল সাধনে বিস্তর সহায়তা করিবে।

মহারাজা বাহাদুর এখানেই নিবৃত্ত হইলেন না। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার মানসে, স্বীয় পুত্র শশীকান্তকে সুদূর ইংলণ্ড দেশে

কুমার শশীকান্তের বিলাত যাত্রা

প্রেরণ করিলেন। কানসাট কাছারীর ম্যানেজার মিঃ জে, আর হলো সাহেব, কুমার বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া বিলাত রাখিয়া আইসেন। মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং বোম্বে পর্য্যন্ত কুমার বাহাদুরের সঙ্গে যাইয়া বিদেশীয় অর্ণবপোতে তাহাকে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়—সেই পিতা পুত্রের বিচ্ছিন্ন-সময়ে, কুমার শশীকান্ত পিতার দিকে সজল নেত্রে চাহিয়া যখন মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তখন কর্ত্তব্যপরায়ণ সূর্য্যকান্ত, কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রাণ ফাটিবার উপক্রম হইল বটে; কিন্তু

বদনে তাহার কোনই চিহ্ন বিকাশ পাইল না। ওহো, কর্ত্তব্যের কি দারুণ কঠোরতা !! কর্ত্তব্য-পথ বড় কঠিন ! হৃদয় পাষাণ-তুল্য সুদৃঢ় করিতে না পারিলে কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া যায় না। তাই এরূপ স্নেহের পুতুলি শশীকান্তকে স্বহস্তে দুস্তর সাগর-জলে ভাসাইয়া দিয়াও কর্ত্তব্য-শীল সূর্য্যকান্তের হৃদয় কিছুমাত্র দুর্ব্বল হইল না। কর্ত্তব্যের সাধনা করিতে গিয়া স্নেহ-মমতাকে বলিদান দিতে না পারিলে হৃদয়ের মহত্ত্ব কিরূপে বিকাশ পাইবে ? এত উচ্চ হৃদয় না হইলে আজ সূর্য্যকান্তের নাম এত প্রীতির সহিত ঘরে ঘরে নিনাদিত হইত না।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

দেবসেবায়।

সর্ব্ব-শক্তি-সম্পন্ন ভগবানের বাসনা হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি,—তাঁহারই ইচ্ছা ক্রমে জগৎ পরিচালিত। তাঁহার করুণা ব্যতীত আমরা মুহূর্ত্ত কালও জগতে অবস্থান করিতে পারি না। সুতরাং তাঁহার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-মানব, কেহ ধর্ম্ম যোগে,—কেহ বা কর্ম্ম যোগে, সেই কৃতজ্ঞতা-সূচক ভক্তি বিকাশ করিয়া থাকেন। সংসার অনিত্য,—দেহ নশ্বর,—এখানে নিজের কিছুই নাই,—কেবল মায়াময়ের মায়া-মাত্র, ইত্যাদি বৈরাগ্য-সঞ্জাত-ভাব নিচয়, যাঁহাদের মর্ম্ম স্থানে বিরাজিত ;—যাঁহারা প্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া কেবলই নিবৃত্তি মার্গে পরি-ভ্রমণ করিতে উন্মুখ, তাঁহারা সংসারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নিবিড়-নীরদ-মালা-লাঞ্ছিত অন্ধকার বিশিষ্ট অরণ্যে জনশূন্য দুর্গম প্রদেশে বসিয়া একাগ্র-চিত্তে তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। এই ধ্যান, ধর্ম্ম

যোগের অন্তর্ভুক্ত ;—ধর্ম্মই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। সংসারের বিভিন্ন আবিলতা-পরিপূর্ণ বিষম ঘূর্ণাপাকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে তাঁহাদের সাধ যায় না। ধ্যান বলে ভগবানকে সন্তুষ্ট করাই তাঁহাদের বাসনা।

পক্ষান্তরে যাঁহারা বাসনার দাস,—কর্ম্ম, যাঁহাদের কর্ত্তব্য পথে দণ্ডায়মান,—কর্ম্মক্ষেত্রই যাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধনের লীলাভূমি, তাঁহারা কর্ম্মের সাধনা দ্বারা ভগবানের সাধনা করিয়া থাকেন,—কর্ম্মই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন,—তাঁহাদের "life is nothing but full of works." মহারাজা সূর্য্যকান্ত এই শ্রেণীর সাধক ; তাঁহার সাধনা স্রোত বাসনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কর্ম্ম-পথে পরিচালিত। তিনি কর্ম্মের সাহায্যে ভক্তি-বিমিশ্রিত ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাধকগণ প্রায়শঃ অর্চ্চনাদি দ্বারা ভগবানের মনস্তুষ্টি-বিধানে যত্নপর হইয়া থাকেন। "যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং,"—তাঁহার সেবা কে না করে ?

মহারাজা সূর্য্যকান্ত, কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্ররোচনায় স্বীয় সম্পত্তি টুকুর যেরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ দেব-সেবায়ও বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে "বার মাসে তের পার্ব্বণ" হইয়া থাকে। সুবচনীর পান সুপারী হইতে আরম্ভ করিয়া দোল-দুর্গোৎসবাদি যাবতীয় বার্ষিক ক্রিয়াই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই দেব-সেবার জন্য বিপুল ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন ; তাহারই উপস্বত্ব দ্বারা দেব-সেবার কার্য্য হইয়া থাকে।

মুক্তাগাছার বাটীতে ৺গোপাল দেব, ৺আনন্দময়ী কালী, ৺বিমলেশ্বর শিব ; বালিদিয়া কাছারী বাড়ীতে ৺রঘুনন্দনেশ্বর শিব ; চাঁপাপুর, ৺জগন্মাতা প্রভৃতি নানা দেব দেবী স্থাপিত থাকিয়া প্রতিদিন অর্চ্চিত হইতেছেন। ভগবানে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি সন্নিবিষ্ট।

৺গোপাল দেব খানাবাড়ী মধ্যে গৃহদেবতা রূপে অবস্থিত। প্রতিদিন নিয়ম মত অর্চ্চনা এবং ভোগ হইয়া থাকে! ভোগের অন্ন আগন্তুক অতিথি-স্বরূপ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। প্রতিদিন ভোগের বরাদ্দ থাকায় ৺গোপালের অনুগ্রহে বহুলোক প্রতিপালিত হইতেছে। দৈনিক গড়ে ৭০।৮০ জন লোকের অন্ন সংস্থান ঘটে। এই বন্দোবস্ত থাকার জন্য বিভিন্ন স্থানের আগন্তুক মাত্রেই বিশেষ উপকৃত। মুক্তা গাছার ন্যায় স্থানে আসিয়া একবেলা চারটে অন্নের সংস্থান হয় বলিয়া তাহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। দেবসেবার সঙ্গে সঙ্গে আতিথ্য-সৎকার করাও এক কর্ত্তব্য কাজ। ৺গোপালের শরীরে বহুবিধ মূল্যবান অলঙ্কার আছে।

৺গোপাল দেব।

৺আনন্দময়ী কালী এবং ৺বিমলেশ্বর শিব, ভদ্রাসন হইতে একটু দূরে অবস্থিত। এই স্থান, 'কালীবাড়ী' নামে সর্ব্বজন-পরিচিত। এখানেও প্রাত্যহিক পূজা এবং মায়ের বাড়ীতে দৈনন্দিন ভোগের ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বে মায়ের বাড়ীতে দৈনিক ভোগের বরাদ্দ ছিল না; কেবল অষ্টম্যাদি তিথি সংযোগে ও পর্ব্বাদি উপলক্ষে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ভোগ দেওয়া হইত। দেবানুগৃহীত সূর্য্যকান্ত প্রত্যহ দেবতার ভোগ দেওয়া সঙ্গত ও সুবিধাজনক মনে করিয়া বরাদ্দের মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ প্রতিদিন ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। উপস্থিত মত আগন্তুক ব্রাহ্মণগণ মায়ের প্রসাদ পাইয়া থাকেন। আতিথ্য সৎকারের ইহাও একটী সহজ সুযোগ নহে। কিন্তু মানুষই মানুষের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। এই ভোগ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের জন্য এমন কতকগুলি অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত

কালীবাড়ী ৺বিমলেশ্বর শিব।

৺আনন্দময়ী কালী।

স্কুলে' কালী।

হয়, যদ্দরুণ তাহার সেই মহদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। এক সময়ে মায়ের নাম "স্কুলে' কালী" বলিয়া লোকে উপহাস করিত। এই সব নানা কারণে তিনি বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। আগন্তুক নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণগণের সুবিধার জন্য তিনি প্রাত্যহিক ভোগের ব্যবস্থা করিয়া যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ আসিয়া তৎসিদ্ধি বিষয়ে বিষম অন্তরায় ঘটিল দেখিয়া ১৯০৮ খৃঃ অব্দে ভোগের বরাদ্দ কমাইয়া ফেলিলেন। বরাদ্দ কম হইলেও দৈনিক ভোগের ব্যবস্থা ঠিকই রহিল। তাঁহার জীবনে এই স্থানে বিশেষ দৌর্ব্বল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত বাধা টুকু দূর না করিয়া মায়ের প্রতি অত্যাচার করা ঠিক হয় নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে সেই সামান্য বাধা টুকুর মূলোৎপাটন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। তাহা না করা হৃদয়ের দুর্ব্বলতার বিকাশ মাত্র। মায়ের শরীরে মণিমুক্তা-খচিত বিস্তর বহুমূল্য অলঙ্কার আছে। 'কালীগঙ্গা' নামে, মায়ের বাড়ীতে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান রহিয়াছে।

বার আনীর শিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আচার্য্য বংশের আদিপুরুষ রাম রাম আচার্য্য, সম্পত্তির ষোল আনা হইতে নিজাংশের ।০ চারি আনা পৃথক করতঃ নিজেও পৃথক ভাবে অবস্থিতি করেন। বার আনা অংশের মালীক অপর তিন ভ্রাতা কিয়দ্দিবস একত্রেই অবস্থান করেন। এই সময় বার আনা অংশ হইতে 'ঠাকুর বাড়ীতে' যে শিব স্থাপিত হয়, তাহা "বার আনীর শিব" নামে খ্যাত। অন্যতম জমিদার জগৎ বাবুর পূর্ব্ব পুরুষ পৃথক হওয়ার সময় ঠাকুর বাড়ীতে নিজ ভদ্রাসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে "বার আনীর শিব" জগৎ বাবুর বাড়ীতেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তর কালে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সঙ্গে

সঙ্গে স্বীয় স্বীয় অংশানুসারে পূজার সময় নির্দ্দিষ্ট হয়। পূজা দেওয়ার এক এক জনের নির্দ্দিষ্ট অংশের নাম "পালা"। মহারাজা সূর্য্যকান্তও এই দেবালয়ের একজন অংশী। তাই পালা-ক্রমে তিনিও পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; এখানকার পূজার পালা, ৺রাজরাজেশ্বরী বাড়ীর নির্দ্দিষ্ট পালানুসারেই স্থিরীকৃত হইয়াছে। পালার মধ্যে চতুর্দ্দশী তিথি পড়িলে এখানে মহারাজার তরফ হইতে একটী পাঁঠা বলিদান দেওয়া হয়।

পালা।

৺রাজরাজেশ্বরী, আচার্য্য বংশের আদি পুরুষ শ্রীরাম রাম আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়া এ পর্য্যন্ত এই বংশের কুল-দেবতা রূপে অর্চ্চিতা হইয়া আসিতেছেন। ইহাতে ষোল আনারই অংশ আছে। প্রত্যেকের পালা অনুসারে পূজা হইয়া থাকে।

৺রাজরাজেশ্বরী।

মাসের ১লা হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শে পর্য্যন্ত আট আনা অংশের পূজার পালা। এই আট আনা অংশ বলিতে জগৎ বাবুর তরফ বিনায়ক বাবুর তরফ, উত্তরের চৌতরফ এবং পুবের চৌতরফ বুঝাইবে। তন্মধ্যে উত্তরের চৌতরফ এবং পুবের চৌতরফ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে পূজা না দিয়া পূজার স্বত্ব ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে জগৎ বাবুর তরফে কিছু কিছু টাকার বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছে;—পূজা, জগৎ বাবুর তরফের পূজার সঙ্গেই হইয়া থাকে। ঐ বিশ দিবসের মধ্যে ১১ই হইতে ১৪ই দুপ্রহর পর্য্যন্ত বিনায়ক বাবুর তরফ হইতে এবং ১৬ই হইতে ২০শে দু'প্রহর পর্য্যন্ত সাবেক চারি আনী হইতে স্বতন্ত্র ভাবে পূজা হইয়া থাকে। এই কয়দিন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজা হইলেও পূর্ব্বোক্ত সম্মিলিত অংশের পূজা স্থগিত থাকিবে না। ২১শে, হইতে মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত রাজবাড়ীর পালা।

পূজার নিয়ম।

নির্দ্দিষ্ট পালা অনুসারে প্রতিমাসে পূজা হইলেও ৺ শারদীয়া পূজার সময় একটু বিশেষ জাঁক জমকের সহিত অর্চ্চনা করা হয়। এই সময়ে পালা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট তরফের পূজা হইয়াও ষোল আনা হইতে পৃথক পৃথক ভাবে বলিদানের ব্যবস্থা আছে।

বলি-বিভ্রাট।

৺শারদীয়া পূজোপলক্ষে মুক্তাগাছা ৺রাজরাজেশ্বরী বাড়ীর বলি-বিভ্রাট এক বিষম বিভ্রাট! অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই বিভ্রাট চলিয়া আসিতেছে। বলিদানের গোলযোগ নিয়া এক এক বৎসর এমন সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে যে, সেই সংঘর্ষণে দুই একটী লোক "পপাত ধরণীতলে" না হইলে উহার নিবৃত্তি হয় না। চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া কমিশনার সাহেব পর্য্যন্ত এই বিভ্রাটে শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সম্যক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বলির মামলা।

৺রাজরাজেশ্বরী-বাড়ীর বলিদান-বিষয় নিয়া ১৮৩০ খৃঃঅব্দে বিমলা দেব্যা মজহুয়া, চন্দ্রাবলী দেব্যা তরফছানী, ও হরি নারায়ণ আচার্য্য গয়রহ মজাহেমানে তুমুল মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। সেই সময় "পণ্ডিত আদালতের" ব্যবস্থাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাপর নির্দ্দেশ করতঃ বলির একটী নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই মোকদ্দমার পর এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি-স্থাপন হয় বটে।

৺রাজরাজেশ্বরী বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা, মধ্য স্থানে লৌহ-বিনির্ম্মিত নাট-মন্দির। স্থান অতি সঙ্কীর্ণ! বলির সময় প্রায় সকল তরফ হইতেই লোক উপস্থিত থাকে,—ইহার পর দর্শকবৃন্দের সমাগম। লোকে লোকারণ্য,—পা বাড়াইবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত থাকে না। এখানকার বলি দেখা যেন একটা বাহাদুরী,—এই বাহাদুরী লাভের জন্য উৎকণ্ঠা-পরবশ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে দর্শকবৃন্দ দলে দলে এই সঙ্কীর্ণ স্থানে

সমবেত হইতে থাকে। বলিদানের পূর্ব্ব হইতেই যখন স্থানটী ধূপান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীম-বিভঙ্গিমায় ভীষণ হইতেও ভীষণে পরিণত হয়,—যখন ব্যাণ্ডপার্টীর রণবাদ্যে সমাগত মানবমণ্ডলী রণোল্লাসে প্রমত্ত হইতে থাকে,—যখন দেশীয় ঢাক ঢোলের কড়্ কড়্ ঘর্ ঘর্ শব্দে মানুষের মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে, তখন স্বতঃই যেন মনে হয়, রণ-রঙ্গিণী রণচণ্ডী রণোল্লাসে উন্মত্তা হইয়া শোণিত লালসায় ধেই ধেই তাণ্ডব নৃত্য সহযোগে ভয়ঙ্কর অট্টহাসিতে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিতেছেন! বাস্তবিক, সে ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিলে প্রাণ আপনা হইতেই উন্মত্ত হইয়া উঠে। এক সময়ে যখন ২।৩ স্থানে বলিকার্য্য আরম্ভ হয়, তখন অজস্র শোণিত-স্রোতের সংস্পর্শে প্রাণও শোণিত-পিপাসু হইয়া উঠে। বাদ্যের তালে তালে দেহ মন আপনা হইতেই যেন কি এক রণ-ঘটায় নাচিয়া উঠে। সে রণ-খেলার ভীষণ ভাবাবলোকনে,—সেই অজস্র খণ্ড-ছাগ-নিঃসৃত উষ্ণ-শোণিত-প্রবাহে কার প্রাণ স্থির থাকিতে পারে? কার প্রাণে উত্তেজনার প্রকোপ বৃদ্ধি না হয়? উষ্ণ শোণিতের উষ্ণত্ব উপলব্ধি করিয়া তখন সকলেই উন্মত্ত-প্রায়,—ধর্ত্তা, কর্ত্তা, বলিকর, সকলেই তখন রণোন্মাদে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য,—'ধর, মার, কাট' ব্যতীত আর কোন ক্রিয়াই তখন তাহাদের প্রাণে জাগ্রত হয় না। সুতরাং বিভ্রাট না ঘটিবার হেতু কি? তারপর এরূপ অনেক কর্ম্মচারী আছেন, যাঁহারা স্বার্থের সূক্ষ্ম আশা হৃদয়ে পোষণ করতঃ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া অনর্থক "গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করার ন্যায়" একটা মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিতে পারিলে বিস্তর সুখানুভব করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় গোলযোগ বাঁধিতে অধিক বিলম্বের প্রয়োজন হয় না। এই বলি কার্য্য নিয়া পূর্ব্বে বহু মোকদ্দমা হইয়াছে, বহু অর্থ, শোণিত-স্রোতের ন্যায় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে।

১৮৩২ খৃঃঅব্দে ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এক মোকদ্দমা উপলক্ষে বলি বিষয়ে শান্তি-রক্ষার জন্য জামিন মুচলিকা লইয়াছিলেন।

বলির নিয়ম ভঙ্গ ব্যাপারে কত রক্তপাত;—কত জেলবাস,—কত অর্থব্যয় হইয়া গিয়াছে,তদ্বিষয় চিন্তা করিতে গেলেও শোণিত বিশুষ্ক হইয়া যায়।

মামলা মোকদ্দমার উৎপাতে শ্রীধর বাবুর তরফ হইতে ৺রাজরাজেশ্বরী বাড়ীতে বলির দাবী ছাড়িয়া দিয়াছেন। ঐ তরফ হইতে এখন আর এখানে বলির কোন ব্যবস্থা নাই।

পুনরায় ১৮৯২ খৃঃঅব্দে বলি সম্বন্ধে দ্বিতীয় বার এক ব্যবস্থা হয়; বর্ত্তমানে তদনুসারেই বলির কার্য্য চলিতেছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য বলি বিষয়ক এই দ্বিতীয় বারের নিয়ম প্রণালী পরিশিষ্টে দেখাইয়া দেওয়া গেল।

পঞ্চদশ সর্গ।

লোক সেবায়।

"দয়ার সমান গুণ নাই, দানের তুল্য ধর্ম্ম নাই", পরমপিতা পরমেশ্বরের অসামান্য সৃষ্টি-কৌশলে, এ দুইটী এমন সান্নিধ্যভাবে সম্বদ্ধ যে, একটীর অভাবে অন্যটীর অস্তিত্ব থাকে না; একটী কারণ,—অন্যটী কার্য্য। কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না,—আবার যে স্থানে কার্য্য, সেখানে অবশ্য কোন না কোন কারণ বিদ্যমান, একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। যাহার হৃদয়ে দয়া আছে,—পরের দুঃখ দর্শনে যার প্রাণে যখনই দয়ার সুশীতল বারি-ধারা প্রবাহিত হয়, তখনই সে দুঃখ মোচনের জন্য ইচ্ছা আসিয়া হৃদয়ের গুপ্তদ্বার উন্মোচন করিয়া দেয়;—তখন যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দান না করিয়া মানুষ স্থির থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যিনি দান করেন, তাহার প্রাণে নিশ্চয়ই দয়া আছে, একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য।

দানে মানুষের প্রাণে যে অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় সুখের জ্যোতিঃ প্রতি-ভাসিত করিয়া দেয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। দাতা, গ্রহীতা এবং শ্রোতা,—ত্রিলোকই এ কার্য্যে যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। দান করিয়া দাতার প্রাণে যে আত্ম-প্রসাদ জন্মে, তদপেক্ষা বিমলানন্দ আর কিছুতেই নাই,—সে স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ-প্রতিভাসিতা চিত্তানন্দ-দায়িনী প্রীতি, এ স্বার্থ-সন্তাপিত মর জগতে অতীব দুর্লভ! পক্ষান্তরে, দুঃসময়ে আশ্রয় প্রাপ্তি ঘটিল বলিয়া গ্রহীতাও প্রাণে প্রাণে বিপুল সুখানুভব করিয়া থাকে। তারপর, দাতার দান কার্য্য, যখন ক্রমে লোক-সমাজে বিজ্ঞাপিত হইতে থাকে, তখন হৃদয়বান মানুষ মাত্রেই আনন্দ সহকারে দাতার যশঃকীর্ত্তন করিয়া সুখী হয়। প্রকৃতিরই এই নিয়ম! সুতরাং ত্রিলোকানন্দবর্দ্ধক এমন মহদ্ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে কার না অভিলাষ হয়?

দুর্য্যোধন-সখা বীর-পুঙ্গব কর্ণের বীর হৃদয়ে এক সময়ে দয়ার সুশীতল শান্তি-ধারা প্রবাহিত হইয়া—বীরত্বব্যঞ্জক গুরু-গম্ভীর নাদে সে সুমন্দ স্রোতের কুলু কুলু ধ্বনি মিশাইয়া ত্রিলোকবাসীকে কঠোরে মধুর মিলন দেখাইয়াছিল;—জগতে দাতা বলিয়া তাঁহার নাম ঘোষিত হইয়াছিল। কি সুখ! কি শান্তি!! এমন শান্তি-সিঞ্চিত মধুর ভাবে বিভোর হইতে মানুষ সর্ব্বদাই কি প্রস্তুত নহে?

ভগবানের রাজ্যে ধনী, নির্ধন, দুইই বিদ্যমান। আমি লক্ষপতি বলিয়াই যে, সর্ব্বদা গর্ব্বস্ফুরিতাননে তীব্র কটাক্ষে নির্ধনের প্রতি অতি ঘৃণা ব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব, ইহা ভগবানের ইচ্ছা নহে। ভগবান, আমার নিকট কতকগুলি ধন গচ্ছিত রাখিয়াছেন মাত্র, উহাতে আমার কোনই স্বত্ব স্বামিত্ব নাই,—দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনই তাঁহার অভিপ্রায়। দরিদ্রগণ, অভাবের দারুণ কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক ধনীর দিকেই সজল নয়নে চাহিয়া থাকে। তখন তাহাকে

আশ্রয় দেওয়া ধনীর কর্ত্তব্য। নতুবা ধনের মর্য্যাদা রক্ষা হয় কি? দান বিহীন মানুষের ধন, ভূগর্ভ-প্রোথিত "যক্ষের ধন" * বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত বিপুল ধনের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি দৃষ্টতঃ বিষয়-ভার-ক্লিষ্টাবস্থায় কঠোরতার কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত থাকিলেও ফল্গু-প্রবাহের ন্যায় তাঁহার প্রাণে ত্রিলোকানন্দবর্দ্ধিনী দয়ার সুশীতল বারি-ধারা প্রবাহিত হইত; পরের দুঃখমোচনে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই ব্যস্ত ছিল। জীবনে অনেক দান করিয়াছেন,—সাধারণের অনেক অভাব মোচন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দান, মেঘের ন্যায় ব্যাপক ছিল। মেঘ যেমন কেবল ব্যক্তিগত উপকারের জন্যই বর্ষিত হয় না,—একবার বর্ষিত হইলে অযাচিত ভাবে বহুলোকের উপকার সংসাধিত হয়, তেমন তাঁহার দান প্রভাবে কেবল যে ব্যক্তিগত উপকারই হইয়াছে, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব সাধারণের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইয়াছে।

সাধারণের মঙ্গল স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী ছিল। তিনি জীবনে যে সমস্ত সদনুষ্ঠান দ্বারা এ মর-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই সাধারণের সেবায় নিয়োজিত। লোকের উপকার হউক,—আপামর সাধারণ সুবিধাবোধ করুক,—দেশের অভাব দূরীভূত হউক, ইহাই তাঁহার প্রাণের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া রোগীর চিকিৎসা,—দুর্ভিক্ষে তণ্ডুল বিতরণ,—নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দান,—সেতু নির্ম্মাণ,—জলের কল স্থাপন

---

* প্রাচীন লোকের নিকট শ্রুত হওয়া যায়, কেহ কিছু অর্থ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া পরলোকগমন করিলে, দীর্ঘদিনেও যদি উহার কোন অনুসন্ধান না হয় তবে ঐ ধন যক্ষের অধিকার প্রাপ্ত হয়। অনৈসর্গিক উপায়ে উহা রক্ষিত হইয়া থাকে,—কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। এই ধন যক্ষের ধন বলিয়া পরিচিত।

প্রভৃতি অসাধারণ কার্য্যকলাপে সাধারণের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। এ জগতে স্মৃতির বালুকা স্তূপে মানুষের পদচিহ্ন যেকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহার সুযশঃ অক্ষুণ্ণ !!

ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে

পূর্ব্বে ঢাকা এবং ময়মনসিংহে রেলপথ ছিল না। তখন ভাওয়ালের সুপ্রসিদ্ধ বনভূমি অতিক্রম করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তর গমনাগমন বিপজ্জনক ছিল! শোণিত-লোলুপ দুরন্ত হিংস্র জন্তু এবং নরকুল-গ্লানি দস্যুদিগের করাল কবলে পতিত হইয়া কত শত হতভাগ্য অকালে জীবনতরী কাল-সাগরে ভাসাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে,—কত ব্যবসায়ী, ধন রত্নাদি যথা সর্ব্বস্ব, সেই নীরদমালা-লাঞ্ছিত ঘন-সন্নিবিষ্ট ভীষণ অরণ্যানীর নিবিড় প্রদেশে বিসর্জ্জন দিয়া জীবন মাত্র রক্ষা করিয়াছে! হায় তখনকার সে দৃশ্য কত ভীষণ !! রেলপথ হইয়া দুর্বৃত্তদের সে ভীম-ভৈরব নিনাদ শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন আর ভয়ের কোন কারণ নাই। রেলপথ খোলার প্রস্তাব হইতেই মহারাজা বাহাদুর বিবেচনা করিলেন, এই সময় যদি বিশেষ উদ্যোগী হইয়া এই কার্য্যে যোগদান করা যায়, তাহা হইলে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। তাই ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে আমাদের সদাশয় সূর্য্যকান্ত ২০০০০৲ টাকা মূল্যের প্রায় ৩০০ বিঘা জমি বিনা মূল্যে রেলওয়ে কোম্পানীকে দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন।

জুবিলি এনুয়েল ফেয়ার।

দেশীয় শিল্প কার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য "জুবিলি-এনুয়েল-ফেয়ার (Jubilee Anual Fair) নামক একটী মেলা স্থাপন মানসে ময়মনসিংহের সারস্বত সমিতিকে ১৮৯২ খৃঃ অব্দে রেলওয়ে ষ্টেশনের অদূরে ৬০০০৲ টাকা মূল্যের প্রায় আট বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন। মহদুদ্দেশ্য সংসাধনের নিকট তাঁহার এই সামান্য ক্ষতি কিছুই নহে।

জিলা স্থাপনের পর হইতে ময়মনসিংহে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্থানটীও ক্রমে বিস্তৃত হইয়া বর্ত্তমানে একটী বড় সহরে পরিণত হইয়াছে। যে স্থানে বহু লোকের একত্র বাস, তথায় জল ও বায়ু সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলে স্থানের অবনতি অনিবার্য্য। সহরের পার্শ্ব দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত; উহার সলিলই এখানকার অধিবাসীর একমাত্র সম্বল। সহরের স্থানে স্থানে অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে বটে, কিন্তু উহার জল নানা কারণে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহর যখন নদীতীর হইতে অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিল, তখন তত্রত্য অধিবাসিগণ বাধ্য হইয়াই ঐ সমস্ত দুষিত পুতিগন্ধময় সলিল সেবনে অসুস্থ হইতে লাগিল। সময় বুঝিয়া রণরঙ্গিণীওলা-দেবী লোল রসনা বিস্তার করিয়া অতি সহজেই তাহাদের ভব-যন্ত্রণা দুর করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে প্রতি বৎসর এক ওলাউঠার ভীম দংষ্ট্রাঘাতেই সহর প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠিল, —অন্য রোগের ত কথাই নাই। ভয়-সন্ত্রাসিত প্রজার করুণ আর্ত্তনাদে সূর্য্যকান্তের প্রাণ আর্দ্র হইল; তিনি বুঝিলেন যে, জলাভাবে স্বাস্থ্য ধ্বংসই এই আকস্মিক বিপদের মুল কারণ। তাই প্রভূত চেষ্টার বলে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ময়মনসিংহে জলের কল স্থাপন করতঃ অধিবাসীর একটা গুরুতর অভাব মোচন করিলেন। অধিবাসিগণ ঘরে বসিয়া বিনা আয়াসে অতি পরিষ্কৃত জল প্রাপ্তে বিস্তর আনন্দলাভ করিল। তদ্দর্শনে ওলাদেবীর বিকট ভ্রূকুটি শূন্যে বিলীন হইয়া গেল; আর সে দাম্ভিকতা স্থান পাইল না। এখন সহরের স্বাস্থ্য এত উত্তম হইয়াছে যে, কোন ব্যাধি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজা বাহাদুর এই পুণ্যকীর্ত্তি পুণ্যশীলা স্বর্গগতা পত্নী রাজরাজেশ্বরী দেবীর পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়া হৃদয়ের লুক্কাইত গভীর প্রেম-স্মৃতি

রাজরাজেশ্বরী ওয়াটার ওয়ার্কস্ ময়মনসিংহ

জগতে জাগ্রত রাখিবার মানসে উহার নাম রাখিলেন—"রাজরাজেশ্বরী জলের কল।" পুণ্যশীলার নাম, উপযুক্ত পুণ্যকার্য্যেই সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। যে পত্নীর অভাবে সংসার আঁধার দেখিয়াছেন,—যাহাকে হারা হইয়া নিজের জীবন দুঃখময় বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন,—একমাত্র যে দেবীর অন্তর্ধানে বিষাদিত মনে অতি করুণ স্বরে গাহিয়াছেন ;—

রামপ্রসাদী—সুর।

"আমার কপালে নাই মা সুখ ;
আমি জন্ম নিলেম পেতে দুখ।
দুঃখের উপর দুঃখ তারা, সুখের না পাই গো সারা,
আমার কপাল এম্নি মাগো, সুখ বিলায়ে লই দুঃখ।
মন পূর্ণ অন্ধকারে, শান্তি নাহি মোর ঘরে,
শান্তিময়ী যে ছিল মা, ছেড়ে গিছে দিয়ে দুঃখ।
কপালে থাকিলে দুঃখ মা, তুই কেমনে দিবি সুখ,
তোরে মন্দ বলি মনের দুঃখে, ওগো মা কি ধরে সন্তানের চুক॥
দুঃখের বোঝা লয়ে শিরে, এলেম আমি এ সংসারে,
কেহ আসি নাহি ধরে মা, সবে দেখে বেড়ায় কৌতুক।
রাজা সূর্য্যকান্ত বলে, যা হবার হলো ভবে,
মাগো অন্তকালে লয়ে কোলে, রেখো মায়ের ধর্ম্মটুক॥"

—সেই শান্তিময়ীর পবিত্র নাম, এই কল-নিস্সৃত স্বচ্ছ সুশীতল সলিল রাশির সহিত মানব স্মৃতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার পবিত্র প্রেমের ছবি আরও বিস্ফারিত করিয়া দিবে,—জলদানরূপ মহাপুণ্যের ফলে সুরবালা নিষেবিত চির সুখের দেশে তাঁহার স্থান হইবে !!

স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান কেবল এই স্থানেই শেষ করেন নাই।

"লুইস জুবিলি সেনিটারিয়াম"

দার্জ্জিলিং এর অত্যুচ্চ গিরিশিখরের প্রস্তরময় গাত্রেও তাহার দানশীলতার জলন্ত প্রমাণ

দেদীপ্যমান। তথায় "লুইস জুবিলি সেনিটারিয়াম" (Luis Jubilee Sanitarium) নামক একটী স্বাস্থ্যাবাস স্থাপন জন্য তিনি ১৮৯১ খৃঃ অব্দে অতি আনন্দের সহিত ৩০০০৲ টাকা প্রদান করিয়া একটী গুরুতর অভাব মোচনে সহায়তা করিয়াছেন। যাহারা স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন জন্য দার্জ্জিলিং গমন করেন, তাহাদের পক্ষে, ভয়-সঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশে ঐরূপ সুন্দর একটী আশ্রয় স্থল প্রস্তুত হওয়ায় বিস্তর উপকার হইয়াছে, সন্দেহ কি ?

সূর্য্যকান্ত ফ্রি বেড

তাহার এই অযাচিত বদান্যতায় বিমুগ্ধ হইয়া স্বাস্থ্যাবাসের কর্ত্তৃপক্ষ, মহারাজা সূর্য্যকান্তের স্মৃতি রক্ষার জন্য "সূর্য্যকান্ত ফ্রি বেড" (Surja Kanta Free Bed) নামক একখানি শয্যা বিনামূল্যে খোলা রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই শয্যা সম্বন্ধে নিয়ম হয় যে, প্রতি বৎসর ১লা সেপ্টেম্বর হইতে তিন মাস কাল হাউ খোলা থাকিবে। মহারাজা সূর্য্যকান্ত ঐ সময় মধ্যে যখন ইচ্ছা, গ্রহণ করিতে পারিবেন। তাহাতে কোন বাধা হইবে না।*

* এ সম্বন্ধে সেনিটারিয়ামের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন চন্দ্র মহাশয় ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৪শে আগষ্ট লিখিয়াছেন :—

Darjiling Office of the Luis Jubilee Sanitarium.
August 24, 1891

Raja Surja kanta Acherjee Bahadur
Muktagacha, Mymensingh.

Sir,

I have the honour to inform you that a Free bed to be called after you and kept open for three months every year, * * be opened at the Luis Jubilee Sonitarium Darjiling from September 1, 1891.

Yours &c,
Sd. Hari Mohan Chandra
Secretar .

হায়, সেই পবিত্র শয্যা এখন কাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া সম্মানিত হইবে? কাহার পবিত্র দেহ ধারণে নিজেও পবিত্র হইবে?

রোগ পরিচর্য্যায় মহারাজা

দরিদ্র-সম্প্রদায়ে ব্যাধি-নিরাকরণে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। সংসারে বসতি করিতে গেলে, রোগের হস্ত হইতে ত্রাণ পাওয়া বড়ই দুষ্কর। ব্যাধির বিকট ভ্রূকুটী-দর্শনে কম্পিত-কলেবর না হইয়াছে, এমন লোক অতি বিরল। যাহারা অর্থশালী, তাহাদের ব্যারাম হইলে অর্থাভাবে চিকিৎসার কোনই ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু এমন অনেক হতভাগ্য বিদ্যমান, যাহাদের "দিন ভিক্ষা, তনু রক্ষা।" ক্ষুন্নিবারণের জন্য অন্নের অনুসন্ধান করিবে, না ব্যাধির পশ্চাৎ প্রধাবিত হইবে? কাজেই অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া জীবনে হতাশ হইতে হয়। মহারাজা সূর্য্যকান্ত এই অভাব মোচনের জন্য বহু চেষ্টা, অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া অনেক দারিদ্র পরিবারের শোকাশ্রু সাদরে মুছাইয়া জগতের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দরিদ্রের যে কত উপকার করিয়াছেন, তাহা সামান্য লেখনী-অগ্রে প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব।

মুক্তাগাছা পসি চেরিটেবল ডিসপেন্‌সারী।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে মিঃ আর, এইচ, পসি সাহেব (Mr. R. H. Pawsey) ময়মনসিংহের কলেক্টর এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনির সহৃদয়তায় ময়মনসিংহবাসী নিতান্তই বিমুগ্ধ হইয়াছিল। মহারাজা সূর্য্যকান্ত, এই মহাত্মার স্মৃতি অক্ষুন্ন রাখার মানসে তাহারই নামে মুক্তাগাছায় "পসি চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী" (Powsey charitable Dispensary) স্থাপন পূর্ব্বক স্থানীয় দরিদ্র রোগীর বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। অর্থহীন রোগগণ বিনা অর্থে চিকিৎসিত হইয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছে। একাধারে মহতের স্মৃতিরক্ষা এবং রুগ্নের রোগ-পরিচর্য্যা উভয় মহদুদ্দেশ্যই সংসাধিত হইল। এই কার্য্য সুন্দররূপে

পরিচালিত হওয়ার জন্য ১৮৯২ খৃঃ অব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১৫০০০ টাকা ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ঢাকার "টমসন মেডিকেল হল" (Thamson medical Hall) একমাত্র তাঁহারই চেষ্টা ও অর্থ বলে নির্ম্মিত হইয়া তদ্দেশবাসিগণের বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়াছে। এই কার্য্যে তাহার ১০০০০ দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে।

টম্‌সন্ মেডিকেল হল ঢাকা

মুক্তাগাছার দশ মাইল দক্ষিণে ফুলবাড়ী নামক স্থানে ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে তাঁহারই অর্থে ও প্রযত্নে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই কার্য্যে তিনি এক কালীন ২৫০০৲ টাকা দান করেন; তৎপর প্রতি বৎসর উহার কার্য্য পরিচালনার্থ ৬০০৲ ছয়শত টাকা হারে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

ফুলবাড়ী চেরিটেবল ডিসপেন্‌সারী

জন্মভূমি বাজিৎপুর গ্রামে ১৯০৭ খৃঃঅব্দে ২৫০০০৲ পঁচিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে, স্বর্গগতা গর্ভ্ভধারিণী ত্রিপুরা সুন্দরী দেব্যার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার মানসে তন্নামোল্লেখে "ত্রিপুরা সুন্দরী চেরিটেবল ডিস্‌পেনসারী" স্থাপন করতঃ রোগ পরিচর্য্যা দ্বারা লোক সেবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন।

ত্রিপুরা সুন্দরী চেরিটেবল ডিসপেনসারী।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ,—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুর,—ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনোপলক্ষে তিনি বিস্তার অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। সাধারণের উপকারার্থ অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। যেখানে সাধারণের উপকার,—সেই স্থানেই মহারাজা সূর্য্যকান্ত।

অন্যান্য চিকিৎসালয় স্থাপন।

ময়মনসিংহ সহরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত থাকিলেও, উহাতে একটী গুরুতর অভাব ছিল। মানুষের প্রধান ইন্দ্রিয় চক্ষুর বৈকল্য দূরীকরণের বিশেষ কোনই বন্দোবস্ত ছিল না। এই প্রধান অভাব মোচনের জন্য তিনি ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে চক্ষু-চিকিৎসার উপযোগী যন্ত্রাদি আনয়ন পূর্ব্বক "মেকেঞ্জি আইওয়ার্ড নামক চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য হস্পিটালের (Hospital) কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ৭৬০০৲ টাকা প্রদান করেন এবং উহার পরিচালন কার্য্যে বার্ষিক ৩০০৲ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই কার্য্যে ময়মন সিংহবাসী যে, কতদূর উপকৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত চক্ষুহীন, বিনা অর্থে চক্ষুদান পাইয়া ভগবানের নিকট প্রাণের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

মেকেঞ্জিআইওয়ার্ড ময়মনসিংহ

কলিকাতায় "কাউণ্টেস ডফরিন ফাণ্ড" (Countess Duffrin fund) নামে একটী ফাণ্ড্ আছে; স্থানীয় উন্নতি বিধানই এই ফাণ্ডের উদ্দেশ্য। "ভিক্টোরিয়া জেনানা হস্পিটাল" প্রস্তুত সময়ে তিনি এই ফাণ্ডে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়া নিঃসহায়া রুগ্না রমণীগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়া জেনানা হস্পিটাল।

অশোকাষ্টমী স্নানোপলক্ষে অতিথিসেবা, মহারাজা সূর্য্যকান্তের জীবনে এক মহাকীর্ত্তি। মুক্তাগাছার চারি মাইল পূর্ব্বোত্তর কোণে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরস্থিত বেগুণ বাড়ী, অশোকাষ্টমী স্নানের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এইস্থানে বহু দূরদেশ হইতে যাত্রিগণ স্নানোপলক্ষে সমবেত হইয়া থাকে। স্নানের দুদিন পূর্ব্ব হইতে যাত্রিগণ আসিতে আরম্ভ করিয়া স্নানের দিন স্থানটী লোকে লোকারণ্য হয়,—লোক ধরিতে চায় না। এই সময় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি,—স্থানাভাব, প্রভৃতি নানাবিধ অসুবিধা উপস্থিত হইয়া যাত্রি-

আতিথ্য সৎকারে মহারাজা

গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। যাহাতে তাহাদের সে অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়,—যাহাতে বিদেশে অভাবের বিকট ভ্রূকুঞ্চনে স্তম্ভিত হইতে না হয়, তজ্জন্য পরদুঃখ-কাতর সূর্য্যকান্ত, যাত্রি-সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। স্নানের জন্য যত লোকই সমবেত হউক না কেন, হিন্দুমাত্রেই আহার্য্য পাইয়া থাকে। এক "ডাল ভাত" পাক করিয়া খাইতে যাহা কিছুর প্রয়োজন, তৎসমুদয়ই 'সিধার' সহিত পাওয়া যায়। স্নানের পূর্ব্বদিন এবং স্নানের দিন এইভাবে আহার্য্য বিতরিত হয়। যাত্রিগণ 'সিধা' গ্রহণ করতঃ বৈঠক খানার বারেন্দা, নাটমন্দির, ভিতরবাড়ী, বহির্ব্বাটী, যে কোন স্থানে প্রবেশ করিয়া আহারাদি করিতে পারে। তাহাদের জন্য সে দিন অবারিত দ্বার,—কোন অসুবিধা নাই। এই কার্য্যে তাঁহার যশোগাথা দেশে দেশে বিজ্ঞাপিত,—এরূপ লোক-সেবা সংসারে অতি বিরল। এইকার্য্যে অপর্য্যাপ্ত ধনরাশি ব্যয়িত হইয়া থাকে।

অশোকাষ্টমী যাত্রিসেবা।

ভারতবাসীর দুরদৃষ্ট বশতঃ দেশে দুর্ভিক্ষের অত্যন্ত প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছে। এমন বৎসর নাই, যাহাতে এই রাক্ষসের অত্যাচার বন্ধ হইয়া যায়। দুর্ভিক্ষ-দানবের নিকট ভ্রূকুটি দর্শনে সন্ত্রাসিত হইয়া কত লোক অকালে 'হা, অন্ন হা অন্ন' বলিতে বলিতে জীবন রত্ন-কালের স্রোতে ভাসাইয়া দিতেছে,—কত সোণার সংসার অন্নাভাবে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে; একমুষ্টি অন্নের জন্য পিতা, পুত্রকে ত্যাগ করিয়া অপরিহার্য্য মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, পতি অনায়াসে পত্নীর পবিত্র প্রেমে উপেক্ষা করিতেছে,—কেহ বা পত্নীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া জীবনে ধিক্কার দিতে দিতে উদ্বন্ধনে আত্ম-হত্যা করিয়া অশনের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে। হায়, সে দৃশ্য কি ভীষণ! কি মর্ম্মান্তিক!! মহারাজা সূর্য্যকান্ত দেশের সে অভাব উপলব্ধি করিতে পারিতেন, বুভুক্ষিতের করুণ আর্ত্তনাদ তাঁহার

মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিতে পারিত, দুর্ভিক্ষের অত্যাচার দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইত। কেবল তাহাই নহে, প্রতিনিবৃত্তির পক্ষেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষে মহারাজা।

একদা অভাবের দারুণ কশাঘাতে কঙ্কালাবশিষ্টা জনৈক বালিকাকে উচ্ছিষ্ট ত্যাগের স্থান হইতে পরিত্যক্ত সামান্য কদন্নগুলি অতি যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিতে দেখিয়া সমবেদনার সহিত আক্ষেপ করিয়া কহিয়াছিলেন,—"হায়, ভগবন্, এ তোমার কি লীলা! কেহ সামান্য এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাঙ্গাল, কাহারও বা পঞ্চ ব্যঞ্জনে তৃপ্তি হয় না। কাহাকে তেতালায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায়, উপাদেয় ভোগ্য দ্বারা সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিতেছ,আবার কাহাকে পর্ণ-শয্যায় গাছের তলায় রাখিয়া কষ্ট দিতেছ! প্রভো, যে শিশু না জন্মিতে মাতৃস্তনে তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখ, শিশু উঠিতে পড়িতে দেহে ব্যথা না পায়, এই নিমিত্ত শরীর মাংসল করিয়া পাঠাও; মরুভূমে পান্থ-পাদপ সৃজন কর; যে দিকে চাই, সব দিকেই তোমার করুণার প্রস্রবণ উথলিয়া পড়িতেছে; কিন্তু এ বালিকার অন্ন নাই কেন? তোমার মহিমা, তুমিই জান।"*

১৮৯২ খৃঃ অব্দে ময়মনসিংহ জিলার সদর ও নেত্রকোণা সব ডিভিশনে যে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে, মহারাজা সূর্য্যকান্ত তণ্ডুল বিতরণে বিস্তর অর্থ ব্যয় না করিলে প্রজাপুঞ্জের যে, কত দুর্গতি হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অন্নাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ-কায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার করুণ আর্ত্তনাদ,—ক্ষুধায় 'প্রাণ যায়, প্রাণ যায়' বলিয়া মুমূর্ষের কাতরধ্বনি শ্রবণে কার না প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? কোন্ হৃদয়বান্ সে ভীষণ দৃশ্যাবলোকনে স্থির-চিত্তে বসিয়া থাকিতে পারে? অন্নক্লিষ্টের করুণ বিলাপে, প্রজাপুঞ্জের কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ দর্শনে, মহারাজা সূর্য্য-

দুর্ভিক্ষে তণ্ডুল বিবরণ

---

* শিকার কাহিনী।

কান্তের প্রাণ গলিয়া গেল। অর্থের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল বিতরণে যথাসাধ্য ক্ষুন্নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃপাতী গফরগাঁও থানার অধীন খিৎপুর অঞ্চলে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে দারুণ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়াবলোকনে অধিবাসিগণ সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে কেবল 'অন্নং দেহি, অন্নং দেহি' ব্যতীত অন্য শব্দ নাই। মানুষের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই 'আমায় খেতে দাও' ব্যতীত অন্য সম্ভাষণ নাই। প্রজাগণ এতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত! সেই সময়ে দানশীল সূর্য্যকান্ত প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল বিতরণ করিয়া দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মানবমণ্ডলীর যে মহদুপকার সংসাধন করিয়াছিলেন, তাহার সে সুখস্মৃতি অনন্তকাল ব্যাপিয়া সংসারে বিঘোষিত হইবে।

খিৎপুরে দুর্ভিক্ষ

১৮৮০ খৃঃ অব্দে ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল,—লোকের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। অন্ন-সংস্থান এক বিষম বিভ্রাট! মহারাজা বাহাদুর সেই দুর্দ্দিনে বিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সহৃদয়তার কার্য্য দর্শনে, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহাকে যথোচিত ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।*

ঢাকা ও ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষ

* বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ এ, মুখার্জ্জি, ঢাকা ডিভিশনের কমিশনার সাহেব বাহাদুরের নিকট দার্জ্জিলিং হইতে ১৮৮০ খৃঃ অব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখে লিখিয়াছেন :—

REVINUE DEPARTMENT.
Famine No 2607-78 Form.
Darjiling, the 21st August, 1880.

From
A. MUKHARJEE ESQR.
Secretary to the Government af Bengal.

To
The Commissionor of the Dacca Division.

Sir,
I am directed to acknowledge the receipt of your letter

১৮৭৯ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ববঙ্গে যে' দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তন্মধ্যে বর্ত্তমান টাঙ্গাইল সবডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত আটিয়া অঞ্চলের দুরবস্থা স্মরণযোগ্য। তখন দেশ ধনশূন্য হয় নাই বটে,—কিন্তু ধান্যশূন্য

No 361 M, dated the 10th July 1880, and its enclosures submitting with your remarks a report on the distress which prevailed in the districts of Dacca &. Faridpur, in the hot weather months and the rains of 1879, and the measures taken to meet it. This report is in contenuation of that on the releif operations in Mymensingh. Contained in your letter No 749 of the 12th March last.

2. In reply, I am to convey an expression of the Lieutenant Governor's satisfaction at the manner in which the relief operations were conducted in Dacca. It was creditable to the district officers Messrs Price and Farbes and their subordinations. In Faridpur there was a strong tendency shown by the local officers in the early stages to exaggarate the neccessities of the case, and there does not appear to have been any part of the district at any time. The releif operations in Mymensingh were judiciously conducted.

3. The Lieutenant Governor is gratified to learn that many private gentlemen in all the three districts either rendered matrial assistance to the local officers in organizing relief measures, or showed conspicious liberality in maintaining almshouses for the distribution of food or in subscribing to the relief funds. The Lieutenant Governor requests that the thanks of Government may be conveyed to these gentlemen and more especially to those named on the margin.

Raja Surja Kanta Acharja Bahadur.
* * *
& & &

4. The original reports received with your letter under acknowledgement are returned here with as requested.

I have &.
Sd. A. Mukharjee.
Secy. to the Govt. of Bengal.

হইয়াছিল। সুতরাং কেবল ধনেরই অধীশ্বর হইয়া গর্ব্বিতাননে বসিয়া থাকিলেই অন্ন চিন্তা দূরীভূত হয় নাই। ধন চুষিয়া ক্ষুন্নিবারণ অসম্ভব। প্রাচীন লোকের নিকট জানা যায়, ক্ষুধা ক্লিষ্ট মানব ক্ষুধার প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কচু সিদ্ধ আহার,—কেহবা কদম ফল ভক্ষণ করিয়া,—কেহবা একমুষ্টি মাস কলাইর সহিত রাশীকৃত লাউ সিদ্ধ করতঃ তদ্দারা অতিকষ্টে ক্ষুন্নিবারণ করিয়াছে। সে দুঃসময়ের ভীষণ দৃশ্যের কথা মনে করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ক্ষুধার জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া কত আত্ম-হত্যাই যে, সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। ক্ষুধার্ত্তের সে করুণ আর্ত্তনাদে অধীর হইয়া আমাদের মহারাজা সূর্য্যকান্ত এবং আরও কয়েকজন খ্যাতনামা লোক বিভিন্ন স্থান হইতে আহার্য্য সংগ্রহ দ্বারা বিস্তর সাহায্য করিয়া সুবিমল যশোকুসুমে শোভিত হইয়াছেন। *

আটিয়ায় দুর্ভিক্ষ।

* বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ সি, ডবলিউ, বোলন সাহেব, ঢাকা বিভাগের কমিশনার সাহেবের নিকট ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে (m $\frac{1839}{\text{III Famine}}$ নং) পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহার অংশ বিশেষ নিম্নে প্রকটিত

1. With reference to your lettre no 380 dated the 2nd September 179 and its enclsoures, I am directed to request that you will be so good as to convey the thanks of government to Babu Surja Kanta Rai Bahadur and Maharani Sarat Sunderi Debya for their liberal donations towards the fund for the relif of distress in the subdivision of Alttia in Mymensingh.

Calcutta
The 12th Sep. /79

J. have &.

Sd. C. W. Bollon.

Under Secy to the Govt. of Bengal

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের যে প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে মহারাজা বাহাদুর কুলবাড়ী, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ, জামালপুর, মুক্তাগাছা প্রভৃতি থানার এলাকাধীন স্থান সমূহে বিস্তর তণ্ডুল বিতরণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন।

ফেমিন্ রিলিফ ফাণ্ডে অর্থ দান।

দুর্ভিক্ষের কঠোর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করার মানসে স্থানে স্থানে স্বদেশবৎসল মহাত্মাগণের উদ্যোগে ফেমিন্ রিলিফ ফাণ্ড (Famine Relief Fund) খোলা হইয়াছে। ঐ সমস্ত ফাণ্ড হইতে দুর্ভিক্ষের সময় তৎক্লিষ্ট লোকদিগকে বিস্তর সহায়তা করা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অর্থ দান করা মহারাজা সূর্য্যকান্তের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি ময়মনসিংহ ফেমিন রিলিফ ফাণ্ডে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ১০০০৲ টাকা; ইণ্ডিয়ান ফেমিন্ চেরিটেবল্ রিলিফ ফাণ্ডে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২০০০৲ টাকা এবং বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল্ রিলিফ ফাণ্ডে ২০০০৲ টাকা প্রদান করিয়া দেশের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন। মুন্সিগঞ্জ ফেমিন ফাণ্ডে এবং ফরিদপুর ফেমিন ফাণ্ডেও অনেক টাকা দিয়াছেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ সময়ে ইণ্ডিয়ান ফেমিন্ চেরিটেবল্ ফাণ্ডে ৫০০০৲ টাকা এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ঐ ফাণ্ডে ২০০০৲ টাকা দিয়া দুঃসময়ে দেশে অন্ন সংস্থান করিয়া প্রভূত দান শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

ময়মনসিংহের থানা ঘাট।

স্বর্গীয়া লক্ষ্মী দেব্যা ঠাকুরাণী প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ "থানা ঘাট" নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া সাধারণের নিকট চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। দীর্ঘদিন পরে ঐ ঘাট ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় সহরবাসীর পক্ষে বিস্তর অসুবিধার কারণ ঘটে। মহারাজা সূর্য্যকান্ত সাধারণের এই অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় দুই সহস্রেরও অধিক মুদ্রা ব্যয়

করতঃ উক্ত খাটটী মেরামত করাইয়া দেন। ইহাতে সহরবাসীর বিস্তর উপকার হইয়াছে। সাধারণের অভাব মোচন জন্যই এই ক্ষণজন্মা মহা-পুরুষের জন্ম।

নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করা ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সংসারে পতি-পুত্র-বিহীনা হিন্দু-বিধবাগণের ন্যায় হত-ভাগিনী আর দ্বিতীয় নাই। তাহাদের মধ্যে এরূপ অনেক আছে, যাহাদের দিনান্তে একমুষ্টি অন্নের সংস্থান দূরে থাকুক, মাথা গুজিয়া একটু দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান নাই। এমন শত শত অনাথিনী, অভাবের বিকট ভ্রূকুটি দর্শনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উন্মাদিনী প্রায় পথে পথে পরিভ্রমণ করিতেছে; কেহবা রমণীর সার-রত্ন সতীত্ব-ধনে জলাঞ্জলি দিয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া পৈশা-চিক অভিনয়ে সুখের সংসার পাপ স্রোতে ভাসাইয়া দিতেছে! এবম্বিধা অনাথিনীদিগকে আশ্রয় দিয়া পাপের মাত্রা লাঘব করিতে কতিপয় মহাত্মার উদ্যোগে কলিকাতা বরাহনগরে "বিধবাশ্রম" (Widow's House) নামে একটী আশ্রম স্থাপিত হইয়া এ বিষয়ের একটা গুরুতর অভাব দূরীভূত হইয়াছে। দয়ার্দ্র-হৃদয় সূর্য্যকান্ত এই মহৎ কার্য্যের সহায়তার জন্য ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এককালীন ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ইহাতে অভাগিনীদের কত উপকার হইয়াছে!!

বিধবাশ্রম কলিকাতা।

ময়মনসিংহ সহরটী তাঁহার নিজ অধিকারভুক্ত। এই সহর হইতে বিস্তর আয় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া যে, কেবল আয়ের পথই দেখিতেন, তাহা নহে। স্থানের উন্নতি-সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত-স্বরূপ ছিল। সহরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। জলের কল স্থাপন,—পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। এই পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিতে তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে

ময়মনসিংহের পয়ঃপ্রণালী।

৫০০০৲ মুদ্রা ব্যয় করিয়া স্থানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য সহরবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা সূত্রে আবদ্ধ।

ফায়ার রিলিফ ফাণ্ড; বগুড়া।

বগুড়া সহরে অগ্নিভয় নিবারণের জন্য "ফায়ার রিলিফ ফাণ্ড (Fire Relief Fund)" নামক একটী ফণ্ড হইয়াছে। এই ফণ্ডের কার্য্য কুশলতায় তথায় এবং তন্নিকট-বর্ত্তী স্থানে অগ্নিভয় বহুলাংশে প্রশমিত হইয়াছে। পূর্ব্বের তুলনায় এখন তথায় অগ্নি ভয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজা সূর্য্যকান্ত এই ফণ্ডে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রচুর টাকা সাহায্য দিয়াছেন।

বুয়র যুদ্ধে অর্থ দান।

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তঃপাতী ট্রান্স ভাল নামক স্থানে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন ক্রুজ্জি প্রভৃতি বুয়র যোদ্ধ্গণের রণ-পাণ্ডিত্যে ব্রিটীশ-সিংহ মুহুর্মুহু বিকম্পিত হইতেছিলেন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধের ব্যয়সঙ্কুলন জন্য যখন অর্থ সংগ্রহে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন মহারাজা সূর্য্যকান্ত বিস্তর অর্থসাহায্যে প্রভুভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

সুতিয়া-ব্রিজ।

ময়মনসিংহ হইতে মুক্তাগাছার মধ্য দিয়া সুবর্ণথালী পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের যে একটী সুদীর্ঘ রাজপথ বিদ্যমান, ঐ রাজপথের মধ্যে মুক্তাগাছার চারি মাইল পূর্ব্বদিকে মনতলা নামক স্থানে সুতিয়া নামক একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত থাকিয়া পথটীকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। নদীর অবস্থা বর্ত্তমানে প্রায় রেখা-মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও এক সময়ে উহার তরঙ্গ-বিক্ষোভিত উন্মত্তভাবাবলোকনে প্রাণ চমকিত হইত,—একদিন উহারও গর্ব্বস্ফুরিত স্ফীত-বক্ষে বাণিজ্য-সম্ভার-পূরিত তরণী-নিচয় লহরী সঙ্গে স্রোতভালে দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া বেড়াইত!! তখন একমাত্র নৌকা ব্যতীত পারাপারের অন্য উপায় ছিল না। গুদারার ভাড়া যোগাইতে

অনেক পথিকের পকেট শূন্য হইয়া যাইত। অসময়ে কেহ তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, এক বিষম বিপদে পড়িতে হইত। পথিকের সে অবশ্যম্ভাবী বিপদ, ধীমান্ সূর্য্যকান্তের প্রাণে সহানুভূতি জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি সাধারণের এই কষ্ট বিদূরিত করার মানসে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া সুতিয়া নদীর উপরে লৌহ-নির্ম্মিত সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সাধারণের গমনাগমন পক্ষে যে কতদূর সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উত্তর কালে এই সেতু, মেরামত করার নিয়মে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের হস্তে অর্পিত হয়। *

* এ সম্বন্ধে রোড্ ছেছ কমিটীর চ্যায়ার ম্যান মিঃ আর, এম, ওয়েলার সাহেব লিখিয়াছেন :—

No. 1020.
From R. M. WALLER, Esqr.
Chairman, Road Cess Committee, Mymensingh.

To

Raja Surja Kanta Acharjee Choudhuri Bahadur.
Dated, Mymensigh, the 4th Sept. 1883.

Sir,

With reference to your letter No 80 dated the 11th ultimo, I have the honour on behalf of the District Road Cess committee to accept with thanks the hand-some gift of the Sutia bridge on the road from Mymensingh to Subarna Khali made by you to the District Road cess committee, who at a meeting held on 31st August /83. passed a resolution (Copy of which is anexed) accepting the gift and agreeing to keep it here-after in repair.

I have the honour to be
Sir
Your obedient servant.
(Sd.) R. M. Waller.
Chairman.

সর্ব্ব সাধারণের উপকার জন্য তাঁহার জীবনে এইরূপ কত শত অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে কার্য্যে মানুষের উপকার হয়,—সাধারণের একটা অভাব দূরীভূত হইয়া যায়, সেই কার্য্যেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন। আর্থিক, মানসিক, শারীরিক সর্ব্ববিধ উপায়েই তিনি লোক সমাজের বিস্তর সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অর্থবলে সর্ব্বসাধারণেই বিশেষভাবে উপকৃত। যে কোন উপায়ে হোক্, লোক-সেবায় তিনি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কলিকাতার "লেডী ডফ্রিণ ফাণ্ড,"—"ময়মনসিংহ বার লাইব্রেরী," "কিশোরগঞ্জ ফিমেল ওয়ার্ড,"—কলিকাতার "লান্সডাউন মেমোরিয়েল ফাণ্ড,"—ময়মনসিংহে "মোক্তার লাইব্রেরী" 'দার্জ্জিলিং নেটিভ এমিউজমেণ্ট" প্রভৃতি সর্ব্ব সাধারণের হিতকর কার্য্যে তিনি বিস্তর অর্থ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। "ষ্টার কমার প্যাথরাম মেমোরিয়েল ফাণ্ড"—"ময়মনসিংহ করোনেশন ওয়েল" তাঁহারই অর্থে বিনির্ম্মিত।

গৌড় ও ময়মনসিংহে লর্ড কর্জ্জন

বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর ১৯০২ খৃঃ অব্দে পর্য্যটন উপলক্ষে গৌড় এবং ময়মনসিংহ শুভাগমন করেন। মহারাজা সূর্য্যকান্ত উভয় স্থানেই তাঁহাকে বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করেন। তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে সহরদ্বয় সুসজ্জিত করিয়া অতি জাঁকজমক সহকারে তাঁহাকে

Exctract from the proceeding of the District Road cess committee held on the 31st August 1883.

Letter No 80 dated the 1st August 1883 from Raja Surja Kanta Acharjee and it was proposed by the chairman and Seconded by the joint Magistrate that the gift of the Sutia bridge on the Road from Mymensingh to Sobornakhaly made by him to the District committee be accepted and that the thanks of the committee be conveyed to the Raja for his hand-some gift.

আতিথ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও বদান্যতা দর্শনে, অত্যন্ত প্রীত হইয়া লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর স্বহস্তে লিখিত লিপি দ্বারা মহারাজা বাহাদুরকে বিস্তর ধন্যবাদ প্রদান করেন।*

মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সারদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় আমাদের মহারাজা বাহাদুরের নিকট বহু ঋণ জালে জড়িত ছিলেন। টাকার তুলনায় তাহার সম্পত্তি বিশেষ কিছুই নহে। মহারাজা বাহাদুর এই ক্ষুদ্র জমিদার মহাশয়ের দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া

ঋণমুক্তি

প্রায় ১৫০০০৲ টাকা ছাড়িয়া দিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকারের চূড়ান্ত সীমা দেখাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সম্পত্তিটুকু স্বীয় সম্পত্তিভুক্ত করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করিলেন না; অনায়াসে টাকার দাবী ছাড়িয়া দিলেন। কেবল এখানেই নহে। তিনি বহু লোককে ঋণের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। লোক সেবায় সূর্য্যকান্তের প্রাণ এতই দ্রবীভূত হইত! মহতের অন্তঃকরণই এইরূপ !!

* লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

Viceroys camp.
Maldah.
February 27th 1902,

My dear Maharaja,

I must in leaving write you a brief line of thanks for your Hospitable entertainment to me during the last two days, and of regret that your illness has prevented you from taking any part in it, I should have greatly enjoyed your company both here and Gour.

As it is I can only express my gratitude for the excellent arrangement made on my be half and hope that you may shortly be fully restored to strength. I am your sincere freind.

Sd. Curzon.

ষোড়শ সর্গ।

স্বদেশ সেবায়।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" জননী এবং জন্মভূমির সেবা করা মানব-জীবনের একটী প্রধানতম কর্ত্তব্য। মহারাজা সূর্য্যকান্ত বাল্যেই মাতৃ-হীন; কাজেই মাতৃসেবার কর্ত্তব্য-সাধন তাঁহার জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই। স্বদেশ সেবাতেই যাহা কিছু কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশের হিত-সাধনে যাহা কিছু কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছেন, জীবনে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে না পারিলেও কার্য্যে ব্রতী হইয়া প্রাণের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করতঃ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে জাতিগত বা ব্যক্তিগত পার্থক্য ভুলিয়া এক মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন জাতীয় নানাবর্ণ-রঞ্জিত পুষ্প-নিচয় চয়নান্তে এক সূত্রে মাল্য রচনা করিতে না পারিলে কৃতিত্বের সম্যক পরিচয় দেওয়া সুকঠিন। বিভিন্ন মতে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত থাকিলে জাতীয় ভাবের উন্মেষ সুদূর-পরাহত। তাই বিংশ শতাব্দীর "স্বদেশী আন্দোলনে" "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই" ভুলিয়া "ভাই ভাই, এক ঠাঁই" ভাবের অবতারণা করিয়া অনেকেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

সমাজ-বন্ধনই জাতীয় মাল্যের সূত্র-স্বরূপ। বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে এ সূত্রে গ্রথিত করিতে না পারিলে, জাতীয় মাল্য রচনা করা দুরূহ ব্যাপার। স্বদেশ-প্রেমিক সূর্য্যকান্ত বিশেষ চিন্তা করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সমাজ-বন্ধনে পূর্ব্ব বঙ্গে এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। উন্নতিশীল কৃতবিদ্য লোকদিগকে সমাজের বাহিরে স্থান দান করিলে যে, সমাজ দিন দিন লোকশূন্য

হইয়া পড়িবে,—বন্ধন-সূত্র গাছি যে ক্রমে শিথিল হইয়া দেশের সমূহ অমঙ্গল সাধন করিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াই সাধারণের অনভিপ্রায়েও আপাত বিসদৃশ-ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালে এই ভাব,—এই বন্ধনই যে, সুদৃঢ় লৌহ-নিগড়ের ন্যায় কার্য্য করিবে তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই।

কৃতীর আদর্শ সকলেই অনুকরণ করিয়া থাকে। সেই অনুকরণের ফলেই মানুষের প্রাণ এক ভাবে গঠিত হয়। তিনি যে উদ্দেশ্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন, যে দিন তাহার সারবত্তা সমাজস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণে প্রাণে প্রবিষ্ট হইবে, সেই দিন জাতীয় জীবনের গঠন কার্য্যে উহা মৃত সঞ্জীবনীর ন্যায় কার্য্য করিবে।

স্বদেশ-প্রীতি-কুসুমে তাঁহার পবিত্র হৃদয়-কন্দর এতই উদ্ভাসিত হইয়াছিল,—স্বদেশের কার্য্যে তিনি এতই মাতোয়ারা হইয়াছিলেন যে, সমাজ-বন্ধনে বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেরই অপ্রীতি-ভাজন হইয়াও,—সাধারণের দুষ্য সমালোচনায় অতি নিম্ন স্থানে আরোপিত হইয়াও, এমন শুভ কার্য্যে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। নানা উপায়ে বাধা প্রাপ্ত হইয়াও উদ্দেশ্য-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় পথ হারা হন নাই। স্বদেশ-প্রীতি হৃদয়ে প্রবল রাখিয়া বিবেকের মতানুসারে স্বীয় মত কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন;—বাধা বিঘ্নের প্রবল তরঙ্গে ভীত হন নাই। বরং পাষাণ-প্রতিম বক্ষঃ পাতিয়া অম্লান-বদনে সে তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়াছেন। এ কার্য্যের শুভফল বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট না হইলেও কাল চক্রের বিঘূর্ণনে একদিন এমন সময় উপস্থিত হইবে, সে দিন আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সর্ব্ব সাধারণের প্রাণেই উহা যুগপৎ পীযূষ ধারার ন্যায় মধুর রসে প্রবাহিত হইবে।

সময়ের পরিবর্ত্তনে দেশের অবস্থা দৃষ্টে তিনি অতি দুঃখিতান্তঃকরণে কহিয়াছেন,—"মানবজীবন কর্ম্মময় করিয়া স্রষ্টা সৃষ্টি করিয়াছেন,

আমাদের করিবার কাজ অনেক আছে; কিন্তু এমনই অপদার্থ আমরা, সে মহৎ কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নানারূপ অকাজ ধরিয়া নীচাশয়ের মত তুচ্ছ বিষয়ের দোষ ধরিতেই সমধিক তৎপর। আর দলাদলি লইয়াই আমরা ব্যস্ত। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে, দলাদলি অপেক্ষা উন্নতি-বিরোধী আর কিছু নাই। দলাদলি সমাজ-বন্ধনে শাণিত কুঠার স্বরূপ। আজকাল জাতীয় উন্নতির কথা লইয়া দেশময় একটা হুলু স্থুলু পড়িয়াছে, উঠিতে বসিতে আমরা জাতীয় মহাসমিতি আর কংগ্রেসের দোহাই দিতেছি সত্য,—কিন্তু এদিকে পঞ্চাশ জন মিলিয়া মিশিয়া এক পরিবার ভুক্ত কি এক গ্রামে থাকিতে পারি না; একজন একটু প্রতিভা লইয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইবার প্রয়াসী হইলে অপর দশজনে চাপিয়া রাখিতে পারিলে, তাহাকে মাথা তুলিতে না দিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, সে বিষয় কি আমরা একবারও চিন্তা করি? ভেত বাঙ্গালীর বল বিক্রম, এ ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, অপরাপর বিষয়ে যদি ইহার শতাংশের একাংশও প্রকাশ পাইত, তবে দেশের এবং সমাজের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইত,—সুখ শান্তি সমধিক বৃদ্ধি পাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। নিরক্ষর কি ইতর শ্রেণীর মধ্যে যদি কেবল এই প্রথা নিবদ্ধ থাকিত, তাহাতে সমাজের বড় কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈর্ষা, হিংসা এবং দলাদলি লইয়া শিক্ষিত এবং বিজ্ঞ লোকও জড়িত, সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে তাঁহারাও ছাড়িয়া কথাটী কহেন না। জাতীয় উন্নতির মূলে একতা, এই কথা যতদিন না লোকের জ্ঞান হইবে, যতদিন না ইহার সংস্কার হইবে, ততদিন দেশের উন্নতি আশা সুদূরপরাহত।" *

আমরা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি নিয়াই বিব্রত। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি হইলে আর দৃক্‌পাত করি না। অন্যের প্রতি ফিরিয়াও চাহি না। প্রত্যেকের

* শিকার কাহিনী।

জন্য প্রত্যেকের একটা সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন, একথা মনেও স্থান দেই না। সুতরাং—

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

—এ স্বর্গীয় ভাবের যথার্থ আস্বাদন আমরা পাইব কেন ? নিজের কথা ভুলিতে না পারিলে,—

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

—কবির এই নিঃস্বার্থ ভাবের মধুর বীণা-নিস্বনই বা আমাদের স্বার্থ-পূরিত কর্ণ-কুহরে স্থান পাইবে কেন ? যেদিন "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" সাজিতে পারিব, সেই দিন যদি আমাদের স্বার্থ-বিদগ্ধ নীরস প্রাণে স্বদেশ-প্রীতি-কুসুম বিকসিত হয়,—সেই দিন যদি প্রাণ অবসাদ-ঝঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উন্নতির জাগ্রত-ঝঙ্কারে নাচিয়া উঠে।

চিন্তাশীল সূর্য্যকান্ত "সকলের তরে সকলে আমরা" এ কথার সার্থকতা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রেমময় প্রাণে বিশ্বজনীন প্রেম উথলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই প্রেম হইতেই স্বদেশ-প্রীতির এত প্রগাঢ়তা !! তিনি জানিতেন, "ভাবনা আছে, কিন্তু উদ্যম নাই বলিয়াই বাঙ্গালী আমরা এত অপদার্থ হইয়া পড়িতেছি। সকলের মনেই যেন কেমন একটা ভাবান্তর আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ; পূর্ব্বের বাঙ্গালা আর এখনকার বাঙ্গালা যেন একদেশ বলিয়া মনে হয় না, পূর্ব্বের বাঙ্গালী আর এখনকার বাঙ্গালী যেন সেই একটী জাতি নহে। বাঙ্গালীর সে

উদ্যম নাই, সে শ্রম-সহিষ্ণুতা নাই; সব দিকে ভাবান্তর, সব ভাবনা-নিমগ্ন; অথচ বাহিরে যেন কি একটা অজ্ঞাত অপরিচিত মুখস্ পরিয়া নিজ নিজ স্বায়ত্ত চাপিয়া রাখিতেছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, দেখিতে পাওয়া যাইবে, সমুদয় লোকের প্রাণ গাঢ় অন্ধকারচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত। পল্লীর দিকে চাও, দেখিতে পাইবে, সব উদ্যমবিহীন জড় ভাবাপন্ন; সে উৎসব নাই,—সে আমোদ নাই,—সে অধ্যবসায় নাই, আছে কেবল ভাবনা, কল্পনা, আর জল্পনা। 'হইতেছে,' 'হইবে' 'যাইতেছি' 'যাইব' 'ব্যস্ত কি' ইত্যাদি ছাড়া 'সাধনায় সিদ্ধি' বাঙ্গালায় এখন আর নাই; অলসতার অতল জলে সব ডুবিয়া গিয়াছে।" * তাই আক্ষেপ করিয়া কহিয়াছিলেন,—"জানিনা, ভগবান, কবে, এই নিমজ্জিত জাতিকে উদ্ধার করিয়া তুলিয়া লইবেন।"

একতা, জাতীয়-জীবন লাভের এক মহা মুদ্গর। এ মন্ত্রের সাধনা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি বিষয়ে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নহে। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, সমবায় শক্তির নিকট তিনি পরাভূত, একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য! দুঃখের বিষয়, এই মহামন্ত্র, ইতর জীবে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে, কিন্তু মানব, জীবশ্রেষ্ঠ হইয়াও সে ধনে বঞ্চিত! সাধনার অভাবই কি ইহার মূল নহে? মহারাজা সূর্য্যকান্ত একদিন এক সারি পুঞ্জীকৃত ক্ষুদ্র পিপীলিকার কার্য্য-কলাপে এক-প্রাণতা দেখিয়া মনের আবেগে কহিয়াছিলেন,—"একতার পর আর শক্তি নাই, একতা মহাশক্তি। মানব! তুমি বিদ্যা বুদ্ধির আত্মশ্লাঘা কর, তোমার আসন সকল জীবের উপরে বলিয়া, অহঙ্কার কর; আর ঘরে ঘরে পড়সীতে পড়সীতে গলাবাজী করিয়া বিচ্ছিন্ন হও, তোমার ধন পরে আসিয়া কাড়িয়া লয়, তুমি অনশনে মর; ধিক্ তোমায়! যদি সংসারে থাকিতে চাও, এই ক্ষুদ্র জীবগুলিকে গুরু স্বীকার করিয়া

* শিকার কাহিনী।

তাহাদের নিকট 'একতা' মন্ত্রে দীক্ষিত হও।" * তাঁহার চিন্তাকুলিত প্রাণে বিবেকের এইরূপ মৃদু মধুর ভর্ৎসনা-বারি, পিত্ত-কোষ হইতে পিত্ত-রাশির ন্যায় বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যানুরূপ প্রাণের সমস্ত আবিলতা-রাশি ক্ষয় করিয়া দিয়াছিল এবং "আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে, আসে নাই কেহ অবনী পরে"—এই মহদ্ভাব, তাঁহার প্রতি শোণিত-বিন্দুতে মিশ্রিত হইয়া হৃদয়ে অপরিসীম দৃঢ়তার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। সেই দৃঢ়তাই তাঁহার স্বদেশ প্রীতির একমাত্র হেতু এবং ইহা হইতেই তাঁহার প্রাণে বিশ্বজনীন প্রেমের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বিশ্বজনীন প্রেম না জন্মিলে স্বদেশ প্রীতির উদ্ভব অসম্ভব!

তিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে বলি দিয়া দেশের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণ স্বদেশ-সেবায় নিয়োজিত ছিল। এই সূত্রে স্বদেশ সেবক মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ আন্তরিক সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবুর কার্য্যকলাপাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গুণগ্রাহী সূর্য্যকান্ত, তাঁহার প্রতি মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন, অধিকাংশ সময়েই অবিচার্য্য প্রাণে তাহা সম্পন্ন করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতেই তাঁহার প্রাণ স্বদেশ-সেবায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—দিবানিশি স্বদেশের চিন্তায় প্রাণ জড়ীভূত থাকিত। কিরূপে স্বদেশের মঙ্গল হয়, কোন কার্য্যে স্বদেশের কালিমা বিদূরিত হইয়া যায়,—কেবল এই চিন্তা! মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সে চিন্তা হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই।

বক্তা সুরেন্দ্রনাথ।

যে দিন কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে কতিপয় স্বদেশবৎসল মহাত্মার উদ্যোগে বিরাট সভা আহূত হইয়াছিল,—যে সভায়

* শিকার কাহিনী।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রেমতোষ বসু, প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী, মৌলবি ইব্রাহিম হোসেন, মৌলবী সরভর খাঁ, আব্দুল মাসিন আরাবী, মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মৌলবী আব্দুল মজিদ, মিঃ খাপার্ডে, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি ভারতের রত্ন-রাজী একত্রিত হইয়া স্বদেশবাৎসল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা জন সাধারণের প্রাণে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই দিন সেই সভায় স্বদেশবৎসল মহারাজা সূর্য্যকান্ত আজানুলম্বিত স্বদেশী বস্ত্র পরিধান করতঃ একমাত্র উত্তরীয় ধারণে নগ্নপদে উপস্থিত হইয়া জনসাধারণের যেরূপ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সে আনন্দোচ্ছ্বাস লেখনী অগ্রে পরিব্যক্ত হওয়া সুকঠিন,—সে সুখ অনির্ব্বচনীয়,—সে শান্তি অক্ষুন্ন,—সে দৃশ্য ততোঽধিক সুখকর !!

কলেজ স্কোয়ারে স্বদেশী সভা।

এই স্বদেশ-সেবা ব্রতে তাঁহার প্রাণ এত মাতোয়ারা হইয়াছিল যে, যখন রাজশক্তির নিদারুণ কঠোরতা মূলে নেতৃবৃন্দ লুক্কাইত অবস্থায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িলেন, — যখন নানারূপ উৎপাড়নে বাধ্য হইয়া স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত মন্দীভূত হইতে লাগিল তখন তিনি প্রায়শঃ দারুণ দুশ্চিন্তার করাল কবলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহযোগে মনের অগোচরেই বলিয়া ফেলিতেন,—"যদি শেষ রক্ষাই করিতে না পারিলে, তবে মজালে কেন?" অহো, কি দুর্ব্বিষহ হৃদয়যাতনা! প্রাণের স্তরে স্তরে যেন ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে !!

তাঁহার প্রাণে সাহস ছিল, হৃদয়ে দৃঢ়তা ছিল। এজগতে কর্ম্মের সাধনা করিতে আসিয়া জীবনে বহু কর্ম্ম করিয়াছেন,—সংসার সাগরের নানা বিপদ-সঙ্কুল ভীষণ বাত্যাকুলিত অসংখ্য তরঙ্গাঘাত অবিচলিত-চিত্তে সহ্য করিয়াছেন। তথাপি উদ্দেশ্য ভ্রান্ত হইয়া কখনও দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার দৃঢ়তা ও সৎ সাহসের

যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "সর্ব্বাপেক্ষা মহারাজের দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়,—বঙ্গচ্ছেদ-ব্যাপারে। ম্যাজিষ্টর হইতে কমিশনার, ছোট লাট হইতে বড় লাট কর্জ্জন বাহাদুর, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই, বঙ্গচ্ছেদ-ব্যাপারে তাঁহাকে সম্মতি দানে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যকান্ত অটল অচল। বঙ্গচ্ছেদ-ব্যাপার দেশের অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ কোন ক্রমেই কাহারও অনুরোধে আপন বিরুদ্ধ মত প্রকাশে সম্মত হন নাই। মহারাজের যশঃসম্মানে তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত স্বদেশী সাধনায় মহারাজের অকপট প্রীতি। এই সকল নানা কারণে মহারাজা অনেক সাহেব সুবার বিরাগভাজন হইতে বসিয়াছিলেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি স্বদেশী সাধনার অনুরাগী ছিলেন।" * কি অলৌকিকী দৃঢ়তা! কি অদম্য সাহস!! তাঁহার উদ্যমশীলহৃদয়ে এই দৃঢ়তা সঞ্চিত ছিল বলিয়াই তিনি জীবনে প্রত্যেকটী কার্য্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; এইরূপ অসীম সৎসাহসের শুভ্র-জ্যোতিঃতে তাহার প্রাণ আলোকিত হইত বলিয়াই তিনি মহাত্মারূপে আজ সর্ব্বজনপূজিত হইয়া আপামর সাধারণের প্রীতিসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছেন।

যার বাসনার স্থায়িত্ব নাই, যার হৃদয়ে দৃঢ়তা নাই, এই কর্ম্মময়সংসারে তাহার জীবন জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্রীড়নশীল মাত্র। তাহার জীবনে জন্ম-মৃত্যু বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। উপযুক্ত দৃঢ়তা ও মনে বল না থাকিলে জীবনে কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না।

মহারাজা সূর্য্যকান্তকে অনেক সময় কার্য্য ব্যপদেশে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে দেখিয়া অনেকেই নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিয়াছে। তিনি কার্য্যোপলক্ষে সময় সময় দূরদেশ পর্য্যটনাদি নানারূপে প্রচ্ছন্নভাব

* ১৫ই কার্ত্তিকের বঙ্গবাসী ১৩১৫ সন।

ধারণ করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য-ভ্রান্ত হইতেন না। দেশের জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত! স্বদেশ এবং তাহার অধিবাসী, তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও অধিক ছিল। কুমার শশীকান্তের বিবাহোৎসব উপলক্ষে ময়মনসিংহ আসিয়া যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় স্বদেশ-প্রীতি সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আন্তরিক ভাব-নিচয় সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন :—

"Gentlemen, I do sincerely thank you for your kind address of welcome, in which you say so many good things about me. I have always endeavoured, Gentlemen, to do my duty towards you in my humble way, and to the utmost of my ability. It is naturally a matter of very great gratification to me to find you appreciate and recognise it. But the regret always is, that one is never able to do as much as one should like to do, and this regret becomes the more uncontrollable as one gets old, and approaches the end of his carear as I have very nearly done.

"Gentlemen, if you, the people of Mymensingh, have claims upon me and I readily grant that you have, might I not say that I have also claims upon you. You very truly say that many are the ties that bind us together. In joy or sorrow, in anything concerning my House, I have always felt that I could turn to you. Therefore, it is, Gentlemen, that I have come home to celebrate the auspicious event of my son's wedding

in my *own* town of Mymensingh, amongst my *own* people.

"For years past I have been, more or less an exile from Mymensingh. But I have been an exile, as some of you would know, having to be by my son in Calcutta to superintend his Education and upbringing. He has now arrived at a man's estate. My anxieties are less. I trust, Gentlemen, he may prove worthy of us all.

"Gentlemen, I am an oldman now. In future you will learn to look to my son. In these days of meaning less cosmopolitanism, and some what undesirable metropolitan life, one is apt to ignore and forget local claims and local affections.

"But I do trust that my son will realise that it is better to be a lord by the Village pump, and well beloved of your own people, than to be the most favoured courtier, the tail of whose name is a string of alphabets. May he bear the love that I have borne for Mymensingh."

মহারাজা বাহাদুর, তাঁহার নিজের দেশ ময়মনসিংহ বাসীকে কতদূর প্রীতির চোখে দেখিতেন,—রাজপুরুষের মোসাহেব অপেক্ষা সর্ব্ব সাধারণের প্রীতিভাজন হওয়া কত সুখকর, তাহা তাঁহার এই উক্তিতেই স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে।

তিনি যদি দেশের প্রীতিতে উন্মত্তপ্রায় না হইতেন,—যদি স্বদেশের কর্ত্তব্যসাধনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া নিজ স্বার্থে বলিদান না দিতেন,—যদি

অলসতা-বিজড়িত আবেশময় লোচনে একটু মাত্র ইঙ্গিত প্রদান করিতেন,তাহা হইলে, আজ তিনি অনায়াসে রাজ-সম্মানাদি বৈভব-স্তূপের শিখর দেশে আরূঢ় হইতে পারিতেন। সম্ভবতঃ আজ তাঁহাকে দুর্ব্বিষহ চিন্তার কঠিন নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইতে সহসা মৃত্যুর করাল ছায়া দেখিতে হইত না। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের অপ্রতিহত স্রোতোবেগ সে পথে পরিচালিত হইল না। স্বদেশ-সেবায় বঞ্চিত হইয়া সে স্বার্থ-সিদ্ধি তুচ্ছ মনে করিলেন। প্রলোভনের সম্মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনেও হৃদয়ের দৃঢ়তা ত্যাগ করিলেন না। দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ চিরকালের জন্য মৃত্যুর পদে উৎসর্গ করিলেন, তথাপি পন্থান্তর গ্রহণ করিলেনানা। ধন্য মহাত্মাগণের হৃদয়! ধন্য মহত্ব !!

এই স্বদেশ-সেবায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া বার্ষিক বিংশ সহস্র মুদ্রার আয়ের সম্পত্তি অবহেলায় নিঃস্বার্থ ভাবে দান করতঃ স্বদেশপ্রেমিক আমাদের মহারাজা সূর্য্যকান্ত "ন্যাসন্যাল কলেজ" স্থাপনে বিস্তর সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যে স্বদেশ-প্রেমিক মাত্রেই উপকৃত। স্বদেশ সেবায় তিনি যতদূর উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন,—দেশীয় জনমণ্ডলীর আন্তরিক ভক্তি এবং প্রীতি লাভে যতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে সুখ-স্মৃতি ইতিহাস অতি সাদরে বক্ষে ধারণকরতঃ ভবিষ্য-জীবনে জীবন্তরূপে জনসমাজে প্রচার করিবে। তাহার কীর্ত্তিগাথা জগতে অতুল !!

ন্যাসন্যাল কলেজ স্থাপন

বিগত ১৯০৬ খৃঃ অব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩১৩ সনের ৭ই বৈশাখ শুক্রবার প্রাতে) কলিকাতা নগরীতে মহারাজা সূর্য্যকান্তের পৌত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহার নাম শীতাংশুকান্ত রাখা হইয়াছে। এতদিনে এই বংশ হইতে পোষ্য রাখার পদ্ধতি দূরীভূত হইল।

শীতাংশুর জন্ম।

সপ্তদশ সর্গ।

স্বর্গারোহণ—চরিত্র।

জীব মাত্রেই কর্ম্মসূত্রে এ সংসারক্ষেত্রে সংবদ্ধ। কর্ম্ম ব্যতীত এখানে আর কিছুই নাই। জীবিতকাল মধ্যে কর্ম্মের অংশটুকু বাদ দিলে জীবনের আর কিছুই থাকে না। কর্ম্মহীন মানুষ মনুষ্যত্ববিহীন। কর্ম্মের তারতম্যানুসারে কেহ কৃতী ও কেহ অকৃতী বলিয়া সংসারে পরিচিত। মহারাজা সূর্য্যকান্ত একজন কর্ম্মী ছিলেন;—কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব লাভ ঘটিয়াছিল। তাই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়।

তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের কর্ম্ম-নিচয় পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ব্বোল্লিখিত সর্গসমূহে সমালোচনা করিয়া চরিত্রের যে মধুর আস্বাদন পাওয়া গিয়াছে, তদতিরিক্ত আরও বহুবিষয় বলিবার আছে, কিন্তু সময় ও স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ তদ্বিষয়ে আপাততঃ নির্ব্বাক্ রহিলাম। তাঁহার কীর্ত্তিগাথার শেষ নাই;—অসীম—অনন্ত! বলিতে গেলেও তাহা শেষ করিয়া উঠা কঠিন।

মানুষের পক্ষে উন্নত জীবন লাভ করিতে গেলে, প্রধানতঃ যে কয়েকটী গুণের প্রয়োজন, তৎসমুদায়ই তাহাতে বিদ্যমান ছিল। তাই বলিয়া যে, তিনি একেবারে নির্দ্দোষ ছিলেন, তাহা নহে। জগতে কেউ কখনও নির্দ্দোষ ভাবে জীবনাতিবাহিত করিয়া যাইতে পারে নাই, ন্যূনাধিক দোষের মাত্রা সর্ব্বঘটেই বিদ্যমান। যে ইন্দ্রিয়াশক্তির জন্য অনেকেই তাঁহার প্রতি কুটিল-কটাক্ষ ক্ষেপণে ভ্রূকুঞ্চন করিয়া থাকেন, সেই ইন্দ্রিয়াসক্তির চরণতলে কয়জন লোক মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারে? প্রভূত স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও কি মানুষ, ঐ দুষ্ট রিপুর প্রহেলিকায় আবদ্ধ হইয়া আপনার গৌরব নষ্ট করে নাই? যে পক্ষে বরং আমাদের

মহারাজা বাহাদুর অনেক উত্তম। কেননা, তিনি শূন্যপ্রাণে অভাবের হস্তে ক্রীড়া-কন্দুক প্রায় হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি যে সমস্ত অমানুষিক গুণনিচয়ে বিভূষিত ছিলেন, তাহার তুলনায় দুই একটী সামান্য দোষ কিছুই নহে; সুবিমল পূর্ণচন্দ্রের পার্শ্বদেশাঙ্কিত সামান্য কলঙ্ক রেখামাত্র। পুরাকালের মুনিঋষিগণও, এমন কি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও সে কলঙ্ককালিমা হইতে একেবারে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন নাই।

তিনি সময়ের মূল্য বুঝিতেন। সময়ের কার্য্য সময়ে সম্পন্ন করিলে জীবনে বহু কার্য্য সম্পাদিত হয়, একথা তাঁহার হৃদয়পটে বিশেষরূপে অঙ্কিত ছিল। ভবিষ্যতের বিলোল-কটাক্ষে বিমোহিত হইয়া অনর্থক কল্পনার-কুহকে আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ, তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল। অথচ অতীতের নিরাশা-ব্যঞ্জক অবসাদে প্রাণ অবসন্ন করিয়া কেবল দিন গণনাতেও প্রমত্ত থাকিতেন না;—কর্ত্তব্য সাধনে একান্ত উন্মুখ ছিলেন।

"Trust no Future, howe'er pleasant !
Let the dead Past bury its dead !
Act,—act in the living Present !
Heart within, and God o'er head."

H. W. Longfellow.

কবিবরের এই উক্তি তাঁহার প্রাণে প্রাণে শিরায় শিরায় সতেজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই তিনি জীবনে এত উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর তিনি একদিনও কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করতঃ 'করিব' এই সামান্য একটা কথার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিয়া কেবল বিলাসিতার মোহময় আবেশে সময়-স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন না। "বর্ত্তমানকে" জীবন্ত জ্ঞানে যাহা কিছু পারিতেন, তখনই শেষ করিয়া ফেলিতেন। এইটী তাঁহার জীবনে মহৎ গুণ ছিল।

তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, তিনি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কেবল উন্নতি-মার্গেই প্রধাবিত হইয়াছেন ;—একদিনের জন্যও অবনতির অন্ধ-গহ্বরের দ্বারদেশে উপনীত হন নাই। সময়ে কর্ত্তব্য সাধনই কি ইহার মূল নহে ?

এদানিক ষ্টেটের কার্য্য ভার চীফ্ ম্যানেজার বাবুর প্রতি ন্যস্ত করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন সত্য,—কিন্তু কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে নিবৃত্ত ছিলেন না। মুহূর্ত্তের জন্যও ষ্টেটের চিন্তা হৃদয় হইতে অপসারিত করেন নাই। কোটীপতি হইয়াও উন্নতির আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই—কেহ পারেনি।

নিরহঙ্কার, তাঁহার জীবনের আর একটী আদর্শ গুণ! তিনি যেরূপ অর্থ বলে বলীয়ান্,—সর্ব্বজন-সম্মানিত, তাহাতে অহঙ্কার করিবার অনেক ছিল। সংসার-ক্ষেত্রের ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে সমস্ত অহঙ্কারের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের তুলনায় মহারাজা সূর্য্যকান্ত ইচ্ছা করিলে অহর্নিশি অহং-রাগ-রঞ্জিত হইয়া গর্ব্বের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক গর্ব্বস্ফুরিতাননে বসিয়া থাকিলেও তত দোষাবহ নহে। কিন্তু তিনি সে ভাব নিতান্তই ঘৃণার চোখে দেখিতেন। তিনি লোকের মর্য্যাদা বুঝিতেন,—ব্যক্তিগত সম্মান প্রত্যেকেরই আছে, এ কথা তিনি বেশ জানিতেন। বাস্তবিক পক্ষে, নিরহঙ্কার জীবনই সুখের জীবন।

ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনের প্রতি তাঁহার বড় একটা আস্থা ছিল না ; বরং কর্ত্তব্য-সাধনে বিশেষ প্রীতি ছিল। মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া যথাসময়েই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া প্রস্তুত থাকিতেন। পদ্মপত্রস্থিত জল-কণার ন্যায় জীবনের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়া ঔদাস্য-মিশ্রিত মৃদু-মধুর-স্বরে গাহিয়াছেন :—

পিলু—যৎ।

"মনরে এ ভবের খেলা তোর দু'দিন পরে ভাঙ্গিতে হবে।
ভব-ঘোরে পড়ে রে মন, ভাবলিনা ভবানী ভবে।
তুমি কি করিতে এলে ভবে একবার মনে দেখ ভেবে,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে শির উচ্চ কত রাখিবে ?
এই মাথা হবে থোতা ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।
তুমি চিত্র পটের গোলাপ হেরে, ভুলিলে তার মধুর লোভে,
এই ধোঁকা হবে ফাঁকা যখন তোমায় নিয়ে যাবে।
যখন জীবাত্মা চলে যাবে (ভবের লীলা সাঙ্গ হবে)
বন্ধুগণ বসে কাঁদবে ;
তুমি যে আপন হাতে মাটী খেলে ইহার ফল তখন পাবে।
যখন দশেন্দ্রিয় বন্ধ হয়ে কঠিন ভূমে শুতে হবে,
তখন সূর্য্যকান্তের ধনৈশ্বর্য্য দশে মিলে লুটে খাবে॥"

তিনি পশু-শীকারে বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তাহাতে তাঁহার মত্ততা একটু বেশী ছিল। এরূপ নিষ্ঠুরতার কার্য্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বলিয়াই যে স্বীয় জীবনের শেষের দিন ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নহে। ভগবচ্চরণে তাঁহার প্রাণ বিশেষরূপে বাঁধা ছিল,—নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি-স্রোতও সতেজে প্রবাহিত হইত! তিনি জানিতেন,—এই সামান্য পশু-শীকারই শীকার নহে, জীবন-সংগ্রামে ষড়্‌রিপুরূপী হিংস্রক জন্তুগুলিকে নষ্ট করিতে পারিলে, প্রকৃত শীকার করা হইবে। সেই শীকারের প্রধানতম অবলম্বন ভগবদ্ভক্তি! তাই শীকারচ্ছলে গাহিয়াছেন :—

(রামপ্রসাদী সুর)

"মন চল যাই শীকার করি,
দুর্গা নাম স্মরণ করি।

যাইতে হবে ওরে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে পাড়ি,
শুনেছি তথায় নাকি বন্য জন্তু ভূরি ভূরি।
বিবেক-বন্দুক ধর, সাবধানে দৃঢ় করি,
ভক্তি-নিশানা করে মার গুলি লক্ষ্য করি।
মন-বাঘ, কাম-ভল্লুক এই দু'টা হয় শত্রু ভারি,
এ দু'টাকে বধ কর্ত্তে পাল্লে যাবে দুই বাহু নাড়ি;
এটাকে বধ কর্ত্তে লাগে, গুরুদত্ত বন্দুক আট নম্বরী।*
হিংস্র-জন্তুর বিভীষিকাতে পেওনা ভয় সাবধান করি;
রেখো বিপদ্ কালে সূর্য্যকান্তে ওগো মা দিগম্বরী॥"

তিনি, জীবনে বহু ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছিলেন; একদিনের জন্যও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া উদ্যম-বিহীন হন নাই; সংসারের লীলা-ললিত ভাবনিচয়ে জীবনের অলীকত্ব উপলব্ধি করিয়া শেষের দিন স্মরণপূর্ব্বক দুঃখ-পীড়িত হৃদয়ে কহিয়াছেন,—"এইত সংসার—এই ত সংসারের লীলা খেলা!—আজ যাহা দেখিতেছি, কাল আর তাহা দেখিতে পাইব না! জীবন বাস্তবিকই পদ্মপত্রের জলবিন্দুবৎ, এই আছে,—এই নাই। কোটী কোটী জীব এই কর্ম্মভূমিতে জন্মিতেছে, আর জলবুদ্‌বুদের মত ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া কি যেন কোথায় মিশিয়া যাইতেছে —এই সকল—'কোথা হ'তে আসে কোথা ভেসে যায়,'—কে তাহা নির্দ্দেশ করিবে? তিন যুগে যাহা স্থির হইল না, আজ যে তাহা স্থির হইবে, এ আশাই দুরাশা।"†

* এই বন্দুকটী মিঃ আফ্‌কার সাহেব মহারাজা বাহাদুরকে প্রদান করিয়াছিলেন। বন্দুকটী অতি উৎকৃষ্ট উপাদানে গঠিত এবং শিকারীর প্রীতিবর্দ্ধক। মহারাজা বাহাদুর এই বন্দুক দ্বারাই অধিকাংশ সময় শীকার করিতেন।

† শিকার কাহিনী।

মানুষ একটু ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই বিলাসিতা-কূপে যেরূপ ডুবিয়া যায়, নিজের দেহখানা যেরূপ যত্নের সহিত রক্ষা করে,—হাতে ব্যথা লাগিবে ভাবিয়া লেখনী পর্য্যন্ত ধারণে যেরূপ অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তিনি সেরূপ বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। মৃত্যু নিশ্চিত,—দেহধ্বংস অনিবার্য্য, একথা তাঁহার বেশ মনে ছিল। কেবল কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কর্ম্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন। তিনি কর্ম্মের জন্য আসিয়াছিলেন কেবল কর্ম্মই করিয়াছেন। আরাম-কেদারায় গা' ঢালিয়া কেবল আরামভোগ, তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

হৃদয়ের দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। দৃঢ়তা না থাকিলে, কার্য্যক্ষেত্রে সুযশঃ পাওয়া অতীব কঠিন। কার্য্য-ক্ষেত্রে কেবল কর্ম্মের সাধনায় কেন, ভক্তির সাধনা,—ধর্ম্মের সাধনাতেও দৃঢ়তার একান্ত আবশ্যক। তাঁহার প্রাণে বল ছিল,—কার্য্যে উৎসাহ ছিল। মনে যাহা সঙ্গত বোধ করিতেন,—যে কার্য্য সাধনে নিজের অথবা দেশের কোন না কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ়তা অধিকপরিমাণে ন্যস্ত হইত। শত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও বিবেক-সিদ্ধ কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এই দৃঢ়তার বলে শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহার নিকট অবনত থাকিত,—তাঁহাকে একটু বিশেষ ভয়ের চোখে অবলোকন করিত!

"এ যুগে যাহা কীর্ত্তি স্মৃতির পরিচায়ক, মহারাজ সেই সাধনায় আত্ম-মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। সে হিসাবে মহারাজ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন সে কর্ত্তব্য পালনে কদাচ তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। মহারাজ স্বদেশী-সাধনাকে দেশের মঙ্গলজনক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; তাই তিনি স্বদেশী সাধনায় প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ বুঝিয়াছিলেন,—রাখী বন্ধন-উৎসবে দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে; তাই তিনি অদম্য উদ্যমে ও অকপট অনুরাগে রাখীবন্ধন

উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়াইত মহারাজা তেজোগর্ব্বের সহিত তাহাতে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।”*

গাম্ভীর্য্য তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, গাম্ভীর্য্যাভাবে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয় না। তাঁহার সেই শান্তিস্থৈর্য্য-শোভিত সৌম্যমূর্ত্তি খানি অবলোকন করিলে,—সেই প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক গম্ভীরাননের বিমল জ্যোতিঃ দর্শন করিলে, কার না প্রাণে সান্ত্বনার মৃদু বারিধারা প্রবাহিত হইয়াছে? আশ্রয়লাভে সমাগত কোন্ ব্যক্তি আশ্বস্ত না হইয়াছে? লোক-পালকের উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য ছিল বলিয়াই লোকে দর্শন মাত্রেই স্তম্ভিত হইয়াছে। কর্ত্তব্যের সাধনায় পুরুষকার দেখাইতে এমন ভাগ্যবান্ আর কে আছে?

মহারাজা সূর্য্যকান্তের নামোচ্চারণে ক্ষমতাপন্ন দুর্জ্জনও বশীভূত হইয়াছে সত্য,—তাঁহার ক্রোধবিস্ফারিত বিকট ভ্রূকুটি দর্শনে দুর্জ্জন চকিতনয়নে কম্পবান্ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিয়তি সে ভয়ে ভীতা হইবার নহে। তাহার কার্য্য সে করিবে,—তাহাতে বাধা জন্মাইবার শক্তি কাহারও নাই। মহারাজার ইহকালের কার্য্য শেষ হইয়াছে দেখিয়া নিয়তি তাড়াতাড়ি পরকালের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।

এদানিক মহারাজার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রায়শঃ রোগাক্রান্তাবস্থায় সময় অতিবাহিত করিতেন। দেহ ত্যাগের কয়েক দিবস পূর্ব্বে কলিকাতায় অবস্থান কালেই তাঁহার শরীর একটু বেশী অসুস্থ বোধ হইতে ছিল। চিকিৎসকগণ শারীরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে তাঁহাকে হাওয়া পরিবর্ত্তন জন্য স্থানান্তর যাওয়ার যুক্তি প্রদান করিলেন। তদনুসারে

কলিকাতা ত্যাগ

* ১৩১৫ সনের ১৫ই কার্ত্তিকের বঙ্গবাসী।

তিনি পুণ্যক্ষেত্র বৈদ্যনাথ ধামে যাওয়াই স্থির করিয়া তদুপযোগী আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময় ৺বৈদ্যনাথ যেন তাঁহাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেছিলেন। তাই কালবিলম্ব না করিয়া অসুস্থ শরীরেই তথায় যাত্রা করিলেন। শ্রীযুক্তেশ্বরী বধূমাতা ঠাকুরাণী, কুমার শীতাংশুর সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

৺বৈদ্যনাথ ধামে গমনের পর অসুস্থতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তথায় ভাল চিকিৎসক না থাকায়, কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়কে নেওয়ার জন্য টেলিগ্রাফ করা হইল। ডাক্তার সরকার মহাশয়, ৺বৈদ্যনাথধামে উপস্থিত হইয়া রোগের অবস্থা নিতান্তই সাংঘাতিক বলিয়া মনে করিলেন। অল্প সময় মধ্যেই ব্যারাম উত্তরোত্তর এত মন্দপথে চালিত হইতে আরম্ভ করিল যে, তিনি একাকী চিকিৎসা করিতে সাহসী না হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল লিউফিস্ সাহেবের নিকট টেলিগ্রাফ করিলেন।

রোগ বৃদ্ধি

এই সময় কুমার শশীকান্ত অধ্যয়নোপলক্ষে সুদূর ইংলণ্ডে ক্যাম্ব্রিজ নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। আহা, কি দুর্দ্দৈব! দেশে তাহার পিতা মুমূর্ষাবস্থায় উপনীত, তিনি সংবাদটী পর্য্যন্ত অবগত নহেন। মহারাজা বাহাদুর এত অল্প সময় মধ্যেই যে, সংসারের সমস্ত মায়া বিসর্জ্জন দিয়া ৺বৈদ্যনাথে বিলীন হইবেন, ইহা কাহারও ধারণাতেই উপনীত হয় নাই। তিনি নিজেও তাহা কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই। জানা গিয়াছে, মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও তিনি কেদেরায় বসিয়া চিঠির ফাইল অনুসন্ধান করিয়াছেন। এ অবস্থায় কি করিয়া এইরূপ বিসদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়?

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকান্ত মজুমদার মহাশয় এই সময় তাঁহার কাতর সংবাদ পাইয়া ৺বৈদ্যনাথ ধামে গিয়াছিলেন। এই

শ্রীকান্ত মজুমদার

বিপদ সময়ে, আত্মীয় বলিতে একমাত্র তিনিই নিকটে ছিলেন। শ্রীকান্ত বাবু, খুল্লতাতকে রীতিমত সেবা শুশ্রূষা করিতে কিছুমাত্র ক্রুটি করেন নাই।

আর একজন মহাত্মা এই সময় বন্ধুত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম,—শ্রীযুক্ত বাবু রামনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি মহারাজার

রামনাথ চক্রবর্ত্তী

বাল্যাবস্থা হইতেই ষ্টেটের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমে প্রাণের বন্ধুরূপে পরিণত হইয়া প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে উন্নীত হন। মহারাজা বাহাদুর যখন যে কোন স্থানে যাইতেন, রামনাথ বাবু তাঁহার সহগামী হইতেন। ইদানীং যদিও তিনি পেনশন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি মহারাজার সঙ্গত্যাগ করিতে পারিতেন না। এ যাত্রা তিনি পূর্ব্ব হইতেই ৺বৈদ্যনাথ ধামে বাস করিতেছিলেন। মহারাজা বাহাদুরের অন্তিম সময়ে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য গতিরোধ করিতে পারিলেন না।

টেলিগ্রাফ পাইয়া ডাঃ লিউফিস্ সাহেব কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সমস্ত শেষ হইয়া গেল। ১৯০৮ খৃঃ অব্দের ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার কৃষ্ণা একাদশীর অন্ধতামসী রজনী-যোগে ২২-৪৫ মিনিটের সময় মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে মহারাজা সূর্য্যকান্ত সংসার শূন্য করিয়া

পরলোক প্রাপ্তি

৺বৈদ্যনাথ প্রাপ্ত হইলেন। মুহূর্ত্তের অস্তিত্ব মুহূর্ত্তে মিশিতে না মিশিতেই যেন কি একটা বিষাদের ঝাপ্টা বায়ু বহিয়া গেল। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকান্ত মজুমদার যথারীতি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

নিজের আশ্রিত জন এবং প্রকৃতিপুঞ্জ; এই নিদারুণ সংবাদে যে, কতদূর মর্ম্মাহত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখনও

তাহারা মর্ম্মান্তিক শোকাশ্রু সহযোগে প্রাণের ব্যথা,—একের অভাবে সংসারের অভাব, পরিব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের জ্বালা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিতেছে।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত, ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সুখ-স্মৃতি,—তাঁহার অক্ষয় যশঃ জগতে চিরস্মরণীয়! তিনি কর্ম্ম বলে মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ কি? যদি কর্ত্তব্য-সাধনার পুরস্কার থাকে তাহা হইলে তিনি মহাত্মা,—যদি দানে ধর্ম্ম থাকে, তবে তিনি ধার্ম্মিক,—যদি একাগ্র-চিত্তে ঈশ্বরের গুপ্ত সাধনার সিদ্ধি থাকিয়া থাকে, তবে তিনি একজন সাধক! সুতরাং এমন ভাগ্যবান পুরুষ আর কোথায়? তাই তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যু,—উভয় দিনই পুণ্যাহ!!

এই দুঃসময়ে,—দেশের এই দুরবস্থার কালে, বঙ্গ-সন্তান আজ ৺বৈদ্যনাথের পর্ব্বতকন্দরে যে রত্ন বিসর্জ্জন দিল, সে উজ্জ্বল রত্নের আর উদ্ধার হইবে না; যে সূর্য্য আজ এই তামসী রজনীর অন্ধকারাবলোকনে অসময়ে অস্তাচলের গুহাশায়ী হইল, রজনীপ্রভাতে সে সূর্য্য আর উদিত হইবে না। একমাত্র যে সূর্য্য-হীনাবস্থায় সাধের বঙ্গভূমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইল, সে সূর্য্য;—এই কৃতিমান্ "মহারাজা সূর্য্যকান্ত!"

"যাও প্রভু, দিব্যযানে অমরভূষিত
দেবতার বাস সেই, দুঃখ-বিবর্জ্জিত;
নিরাশার স্রোত কভু, বহে না সেথায় প্রভু,
শান্তিময় নাম তার শান্তি-নিকেতন;
বৈজয়ন্ত ধামে কর সুখে বিচরণ।
"হিংসা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ নাহি কোন ক্লেশ,
'আমার আমার' শব্দ, আক্ষেপ অশেষ,

দূরে গেছে সে সকল, পার্থিব যতেক বল,
মহাশক্তি, সঞ্চারিবে, শরীরে সুঠাম ;
সুধাপান কর সদা, অই পুণ্যধাম !
"দেবতার রাজ্য সেথা দেবতা সবাই,
পাপ তাপ নাহি, শুধু পুণ্যাত্মার ঠাঁই ;
এ হেন রাজ্যের রাজা, হও গিয়ে মহাতেজা
সুরবালাগলে মালা দিবে পারিজাত,
সুকৃতির ফল, কভু না হবে নিপাত।"

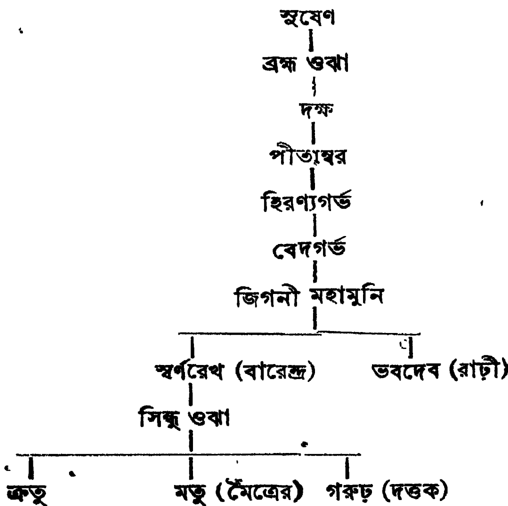
শোকাশ্রু।

পরিশিষ্ট।

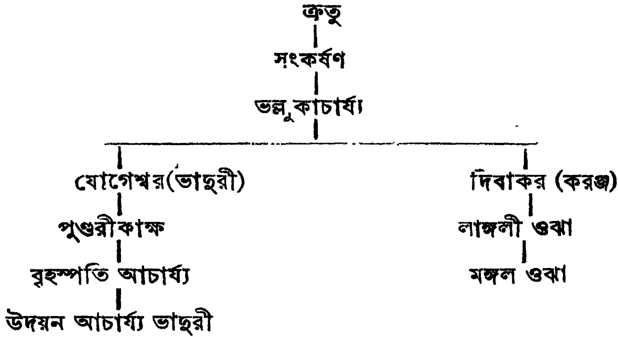
(ক)

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সুষেণ হইতে ক্রতু ও মতুর উৎপত্তি। এই ক্রতু হইতে মুক্তাগাছার আচার্য্য বংশ এবং মতু হইতে নাটোরের রাজ-বংশের উদ্ভব হইয়াছে।

১নং টেবল্।



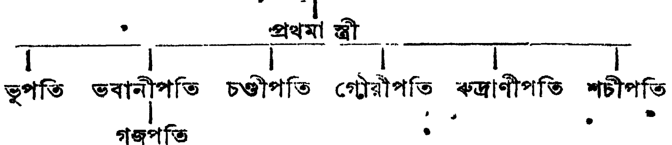
২নং টেবল।

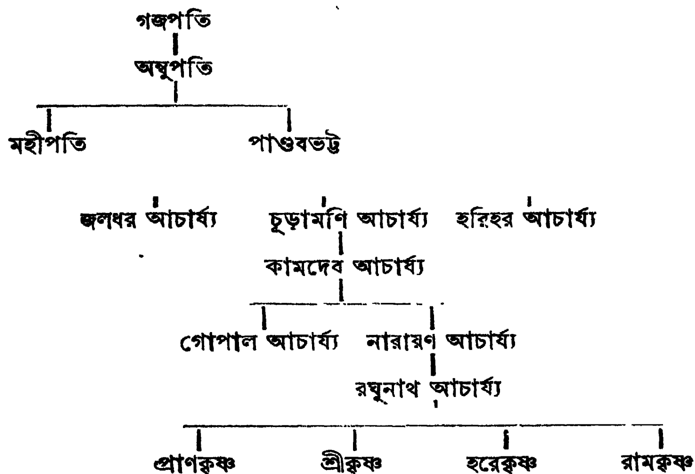


মুক্তাগাছা, তাহিরপুর ও চৌগ্রামের রাজবংশ উদয়ন আচার্য্যের বংশ হইতে উদ্ভূত এবং আমহাটীর রায়, বাহির বন্দরের রায়, নারিটীর ভট্টাচার্য্য, মাগুরিয়ার চৌধুরী, রূপপুরের অধিকারী, ডাঙ্গার চৌধুরী, ব্রাহ্মণী-কুণ্ডার মল্লিক, বেথুরীর চক্রবর্ত্তী ইহারা মঙ্গল ওঝার বংশ-সম্ভূত।

উদয়ন আচার্য্য ভাদুরীর দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে মুক্তাগাছার আচার্য্য বংশের আদিপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হইতে তাহিরপুর চৌগ্রাম প্রভৃতির রাজবংশ সমুদ্ভূত।

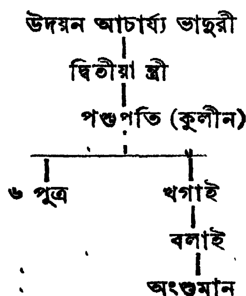
৩নং টেবল।

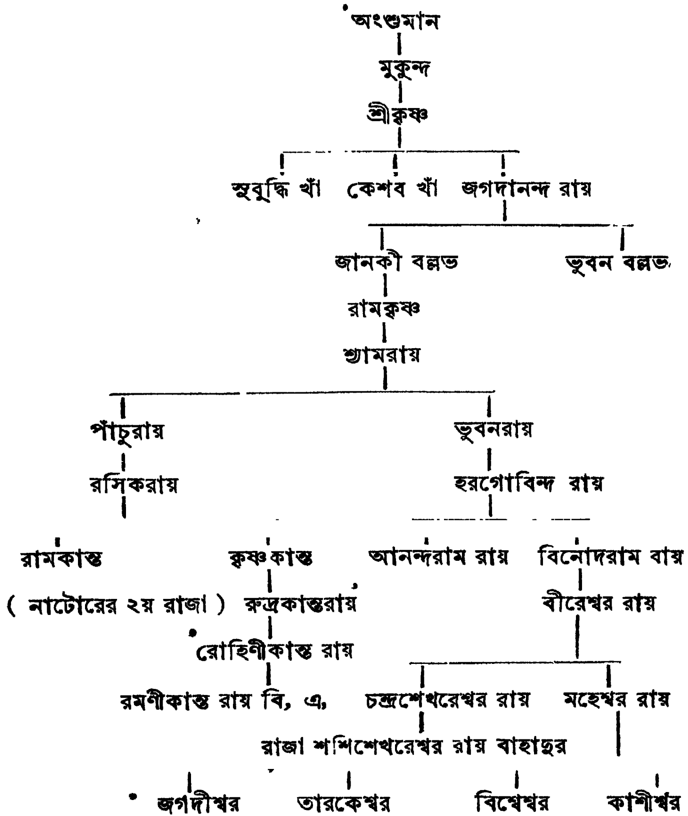




মুক্তাগাছার আচার্য্য বংশের অধিকৃত জমিদারী এই শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যই অর্জ্জন করেন ; এনিই এই জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা।

৪নং টেবল।

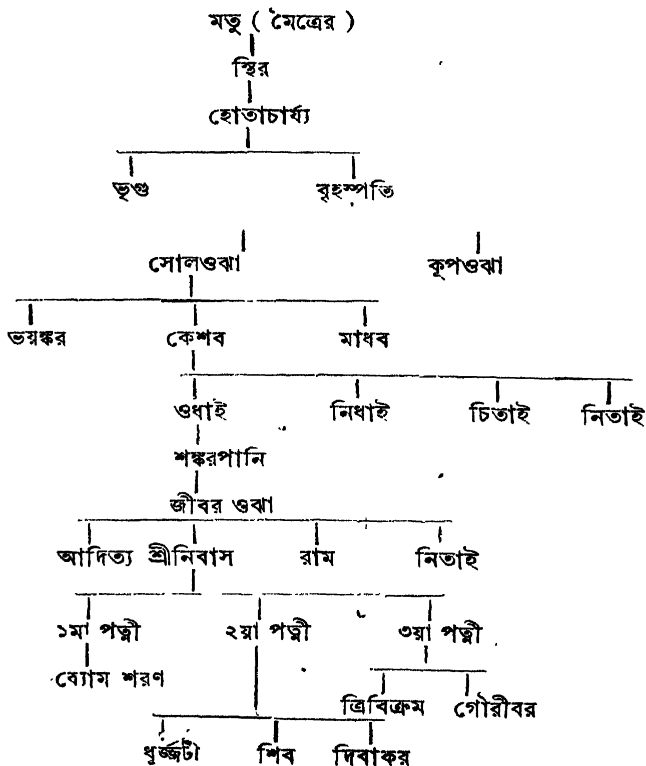


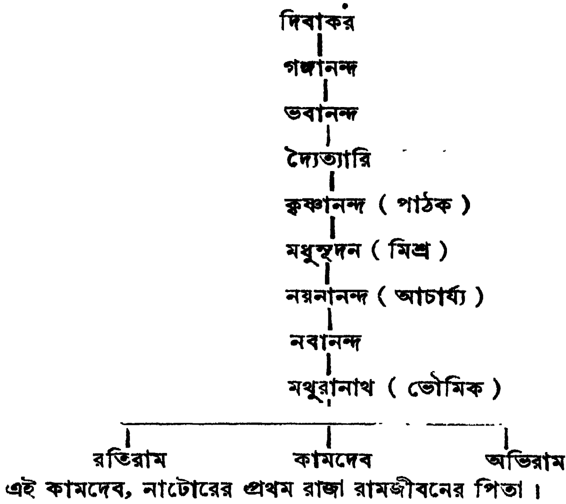


বিনোদরাম রায়, বর্ত্তমান তাহিরপুর রাজবংশের এবং রসিক রায়, চৌগ্রাম রাজবংশের আদিপুরুষ।

সিন্ধু ওঝার দ্বিতীয় পুত্র মতু হইতে নাটোরের রাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। মতুর পুত্র স্থির, সঙ্কটের ভট্টাচার্য্যের আদিপুরুষ।

৫ নং টেবল।

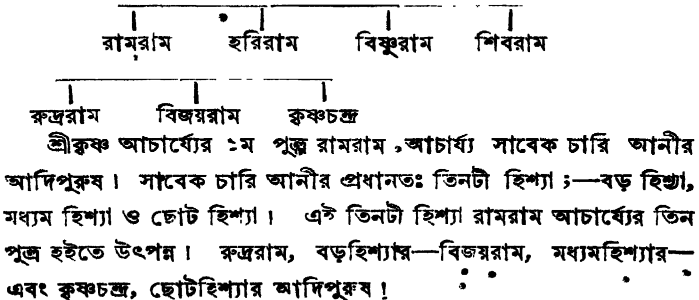




এই কামদেব, নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবনের পিতা।

৬নং টেবল।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য (৩নং টেবল লিখিত)



শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের ১ম পুত্র রামরাম আচার্য্য সাবেক চারি আনীর আদিপুরুষ। সাবেক চারি আনীর প্রধানতঃ তিনটী হিশ্যা ;—বড় হিশ্যা, মধ্যম হিশ্যা ও ছোট হিশ্যা। এই তিনটী হিশ্যা রামরাম আচার্য্যের তিন পুত্র হইতে উৎপন্ন। রুদ্ররাম, বড়হিশ্যার—বিজয়রাম, মধ্যমহিশ্যার—এবং কৃষ্ণচন্দ্র, ছোটহিশ্যার আদিপুরুষ।

৭নং টেবল।

রুদ্ররাম
|
হরিনারায়ণ

গঙ্গানারায়ণ — বিষ্ণুনারায়ণ — রামনারায়ণ

গঙ্গানারায়ণ: নরেন্দ্রনারায়ণ — হেমেন্দ্র নারায়ণ

বিষ্ণুনারায়ণ: হরেন্দ্রনারায়ণ, যোগেন্দ্রনারায়ণ
যোগেন্দ্রনারায়ণ — নগেন্দ্রনারায়ণ বি, এ,
নগেন্দ্রনারায়ণ বি, এ,: অমরেন্দ্রনারায়ণ, হরিদাস, পুলু

রামনারায়ণ: কমলনারায়ণ — মহেন্দ্রনারায়ণ — যতীন্দ্রনারায়ণ

গঙ্গানারায়ণের বংশধর হেমেন্দ্রনারায়ণ ও অমরেন্দ্রনারায়ণ, বড় হিশ্যা বড় তরফের এবং রামনারায়ণের বংশধর যতীন্দ্র নারায়ণ, বড় হিশ্যা ছোট তরফের বর্ত্তমান মালিক।

৮নং টেবল।

বিজয় রাম
|
গৌরীশঙ্কর

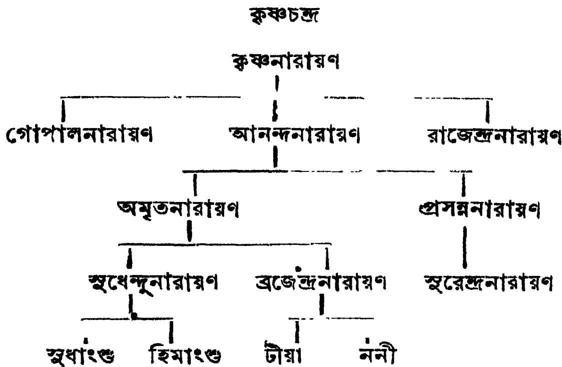
গৌরীশঙ্কর: আনন্দচন্দ্র, রামচন্দ্র

আনন্দচন্দ্র — গোপালচন্দ্র — সুধীরচন্দ্র

রামচন্দ্র: ঈশ্বরচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, কেশবচন্দ্র
ঈশানচন্দ্র — রমেশচন্দ্র — ক্ষিতীশচন্দ্র
কেশবচন্দ্র — কিরণচন্দ্র

আনন্দ চন্দ্রের বংশধর গোপালচন্দ্র, মধ্যম হিশ্যা বড় তরফের; রাম চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র ঈশান চন্দ্রের বংশধর রমেশচন্দ্র, মধ্যম হিশ্যা মধ্যম তরফের; এবং রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কেশব চন্দ্রের বংশধর কিরণ চন্দ্র মধ্যম হিশ্যা ছোট তরফের বর্ত্তমান মালীক।

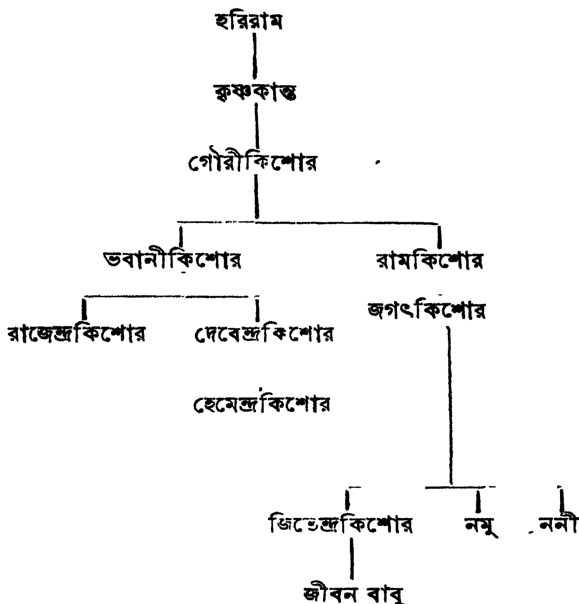
৯নং টেবল।



অমৃত নারায়ণের বংশধর, সুখেন্দু ও ব্রজেন্দ্র নারায়ণ এবং প্রসন্ন নারায়ণের বংশধর সুরেন্দ্র নারায়ণ ছোট হিশ্যার বর্ত্তমান মালীক। সম্পত্তি এজমালীতেই আছে।

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র হরিরাম আচার্য্য হইতে বর্ত্তমানে যে বাড়ী "আটআনী বাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই বাড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে।

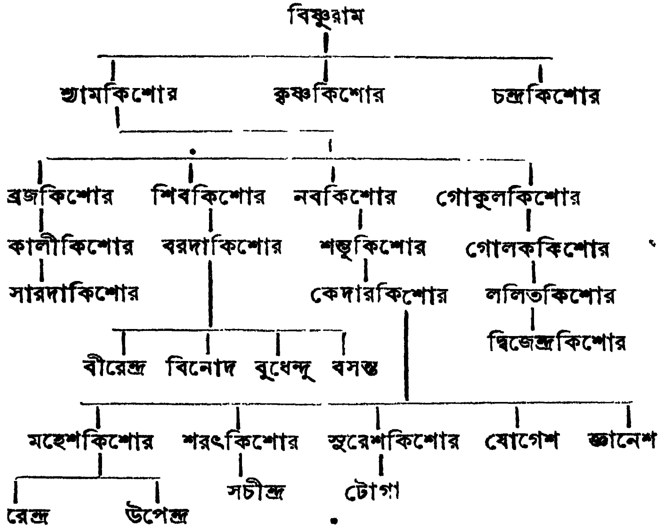
১০নং টেবল।



রামকিশোরের বংশধর জগৎকিশোর, ঐ অংশের বর্ত্তমান মালীক। ভবানীকিশোরের বংশধর হেমেন্দ্র কিশোর, নমিরাবাদস্থ 'দেব নিবাস' নামক বাগান-বাটীতে বাস করিতেছেন। ভবানী-কিশোরের বংশ কেন যে, সম্পত্তির মালীক হইলেন না, তাহা সুযোগ ঘটিলে বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

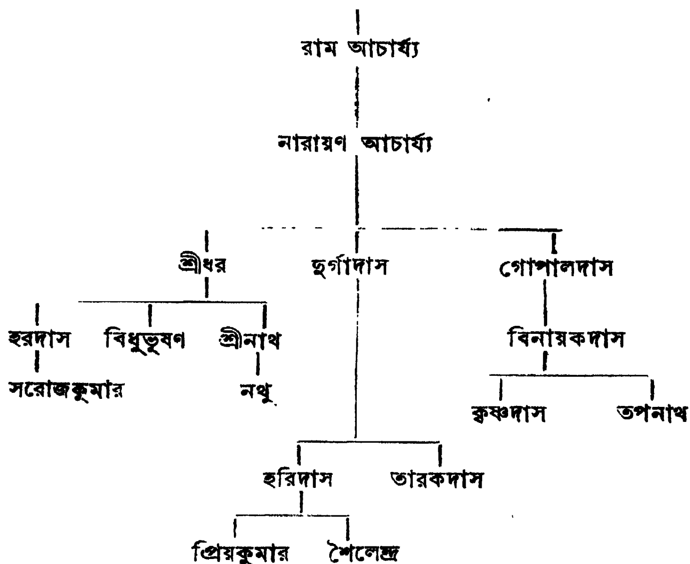
শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের তৃতীয় পুত্র বিষ্ণুরাম আচার্য্য, শ্রীধর বাবুর তরফ, পুবের চৌতরফ ও উত্তরের চৌতরফের আদি পুরুষ।

১১নং টেবল।



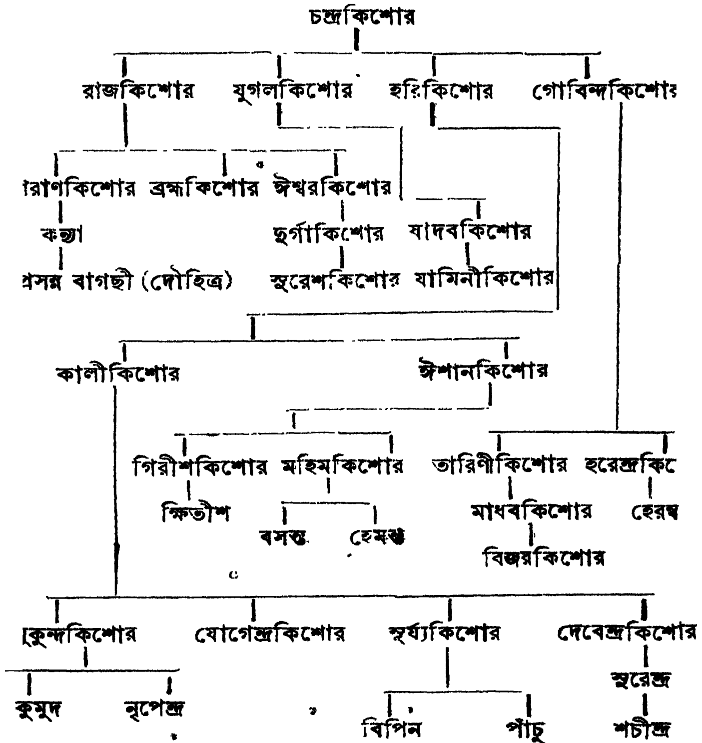
বিষ্ণুরাম আচার্য্যের ১ম পুত্র শ্যামকিশোর হইতে উত্তরের চৌতরফ, ২য় পুত্র কৃষ্ণকিশোর হইতে শ্রীধর বাবুর তরফ ও কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকিশোর হইতে পূবের চৌতরফ উৎপন্ন হইয়াছে। শ্যামকিশোরের পুত্র চতুষ্টয় মধ্যে জ্যেষ্ঠের বংশধর সারদাকিশোর, দ্বিতীয়ের বংশধর বরদাকিশোর, তৃতীয়ের বংশধর সুরেশকিশোর ও কনিষ্ঠের বংশধর দ্বিজেন্দ্রকিশোর বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে থাকিয়া মালীক। এই চারিটী তরফ "উত্তরের চৌতরফ" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১২নং টেবল।



কৃষ্ণকিশোরের বংশধর বিনায়কদাস, হরদাস, বিধুভূষণ, শ্রীনাথ ও তারকদাস, এই সম্পত্তির প্রকৃতমালীক ৺গোপাল জিউর বর্ত্তমান সেবাইত। এই বাড়ী "শ্রীধর বাবুর বাড়ী" বা "বিনায়ক বাবুর বাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচীন লোকে "নারায়ণ মশা'য়ের তরফ" বলিয়াও বলিয়া থাকে।

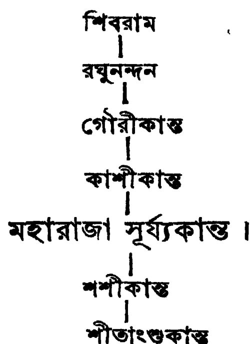
১৩ নং টেবল।



চন্দ্রকিশোরের বংশধর পরাণ কিশোরের দৌহিত্র প্রসন্ন বাগছী, সুরেশকিশোর, যামিনীকিশোর, মাধবকিশোর, হেরম্বকিশোর, কুমুদকিশোর, সূর্য্যকিশোর দেবেন্দ্রকিশোর, ক্ষিতীশকিশোর,

মহিমকিশোর, এই সম্পত্তির বর্ত্তমানে পৃথক পৃথক মালীক। চারিপুত্র হইতে চারিটী তরফের সৃষ্টি; এবং তাহা হইতেই এই অংশের নাম "পূবের চৌতরফ"।

১৪নং টেবল।



শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শিবরামের বংশধর মহারাজা সূর্য্য কান্তের পরলোক প্রাপ্তির পর তৎপুত্র শশীকান্ত, সম্পত্তির বর্ত্তমান মালীক। এই অংশ "দরি চারি আনী" "বা "রাজবাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পরিশিষ্ট।

(খ)

৺ শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ৺ রাজরাজেশ্বরী বাড়ীর বলি-বিভ্রাট সর্ব্বজন-বিদিত। এই বলি নিয়া অনেক মামলা মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। পরিশেষে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বলি সম্বন্ধে শেষ যে ব্যবস্থা হয়, তাহাই বর্ত্তমানে প্রবল আছে। নিয়ম এই :—

সপ্তমী পূজা।

৺ রাজ রাজেশ্বরীবাড়ীর আঙ্গিনাতে চারিটী কাপি বা যোগকাষ্ঠ প্রোথিত হইয়া থাকে। উত্তরের কাপিতে ৺ রাজরাজেশ্বরী দেবীর বলি ;—তাহার দক্ষিণের কাপিতে মহিষ বলি ;—সর্ব্ব দক্ষিণের কাপিতে কাম্যপূজার বলি হইয়া থাকে ; এই তিনটী কাপির সহিতই ষোল আনা তরফের সংশ্রব। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বদিকে যে কাপি প্রোথিত হয়, তাহাতে জগৎ বাবুর নিজবাটীর ৺ মৃণ্ময়ীর বলি হইয়া থাকে ; ইহার সহিত অন্য কাহারও কোন সংশ্রব নাই।

১। উত্তরের কাপিতে জগৎ কিশোর বাবুর এক পাঁঠা বলি হইবে।

২। ঐ কাপিতে রাজা বাহাদুরের এক পাঁঠা বলি হইবে।

৩। ঐ কাপিতে সাবেক চারি আনীর এক পাঁঠা বলি হইবে।

অষ্টমী পূজা।

১। দক্ষিণের কাপিতে জগৎকিশোর বাবুর পালির বলি হইবে।

২। উত্তরের কাপিতে জগৎকিশোর বাবুর ছয় পাঁঠা ও এক মেষ একুনে সাত বলি একাদিক্রমে হইবে।

৩। ঐ কাপিতে রাজা বাহাদুরের চারি পাঁঠা একাদিক্রমে বলি হইবে।

৪। ঐ কাপিতে সাবেক চারি আনীর এক পাঁঠা বলি হইবে।

৫। মহিষের কাপিতে জগৎকিশোর বাবুর এক মহিষ বলি হইবে।

৬। দক্ষিণের কাপিতে জগৎকিশোর বাবুর কাম্য পূজার বলি একাদিক্রমে যত ইচ্ছা হইবে।

৭। ঐ কাপিতে রাজা বাহাদুরের ঐরূপ বলি হইবে।

৮। ঐ কাপিতে সাবেক চারি আনীর ঐরূপ বলি হইবে।

৯। অপর সাধারণের যথেচ্ছা বলি হইবে।

সন্ধিপূজা।

১। উত্তরের কাপিতে জগৎকিশোর বাবুর এক পাঁঠা বলি হইবে।

২। ঐ কাপিতে রাজা বাহাদুরের এক পাঁঠা বলি হইবে।

৩। ঐ কাপিতে সাবেক চারি আনীর এক পাঁঠা বলি হইবে।

নবমী পূজা।

১। উত্তরের কাপিতে জগৎকিশোর বাবুর সাত পাঁঠা ও এক মেষ একাদিক্রমে বলি হইবে।

২। ঐ কাপিতে রাজা বাহাদুরের চারি পাঁঠা একাদিক্রমে বলি হইবে।

৩। ঐ কাপিতে সাবেক চারি আনীর দুই পাঁঠা একাদিক্রমে বলি হইবে।

৪। মহিষের কাপিতে জগৎকিশোর বাবুর এক মহিষ বলি হইবে।

৫। ঐ কাপিতে রাজা বাহাদুরের এক মহিষ বলি হইবে।

৬। দক্ষিণের কাপিতে জগৎকিশোর বাবুর কাম্যপূজার যত ইচ্ছা বলি হইবে।

৭। ঐ কাপিতে রাজা বাহাদুরের কাম্য পূজার যত ইচ্ছা বলি হইবে।

৮। ঐ যন্ত্রে সানেক চারি আনীর কাম্যপূজার যত ইচ্ছা বলি হইবে।

মন্তব্য। এই সব বলির সহিত জগৎকিশোর বাবুর ৺মৃণ্ময়ীর বলির কোন সম্পর্ক নাই। উক্ত বলি তিনি স্বেচ্ছামত যথা ইচ্ছা দিতে পারেন।

পরিশিষ্ট।

(গ)

পরগণে আলাপসিংহের জমিদারগণের বর্ত্তমান নিজ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। রাম রাম আচার্য্যের বংশধর।

সম্পত্তি ।০ চারি আনা অংশ।

তৌজি নম্বর	নাম	পৈতৃক অংশ	খরিদা অংশ	একুন	বিক্রিত অংশ	বাকী
৬নং	সুধেন্দু, ব্রজেন্দ্র, সুরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	/৬৷//	”	/৬৷//	”	/৬৷//
৫নং	দুর্গাসুন্দরী দেব্যা	৫৬৷//	”	৫৬৷//	”	৫৬৷//
৬১২১নং*	গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী	৫১৩৷/	”	৫১৩/	”	৫১৩৷/
৭৯৬৭নং*	রমেশচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী	৫৬৷//	৫৩৷ইদন্তি †	৫৯৬//ইদন্তি	”	৫৯৬//ইদন্তি
৪নং	যতীন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	৫১৩৷/	”	৫১৩৷/	”	৫১৩৷
৬২৯৮নং ‡	নগেন্দ্র, হেমেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	৫১৩৷/	”	৫১৩৷/	”	৫১৩৷

* ৫নং জমিদারীর তৌজি হইতে পরে হিসাব পৃথক করা হইয়াছে।

† শ্রীযুত প্রসন্ননাথ বাগছীর মাতামহ-ভ্রাতা ঈশ্বর ও ব্রহ্ম আচার্য্য হইতে ৫২//২ দন্তি এবং শ্রীযুত সারদাকিশোর আচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষ হইতে ৫১৲ই দন্তি খরিদ করা হইয়াছে।

‡ ৪নং জমিদারীর তৌজি হইতে পরে হিসাব পৃথক করা হইয়াছে।

২। হরিরাম আচার্য্যের বংশধর।

সম্পত্তি ।০ চারি আনা অংশ।

তৌজি নম্বর	গ্রাম	পৈতৃক অংশ	খরিদা অংশ	একুন	বিক্রিত অংশ	বাকী
৮নং ম[illegible]শোর আচার্য্য চৌধুরী						
		।০	৶১।*	।১।	”	।১।

৩। বিষ্ণুরাম আচার্য্যের বংশধর।

সম্পত্তি ।০ চারি আনা অংশ।

তৌজি নম্বর	গ্রাম	পৈতৃক অংশ	খরিদা অংশ	একুন	বিক্রিত অংশ	বাকী
৩নং হরদাস আচার্য্য চৌধুরী	গয়হর					
		/৬॥//	৶১। †	/৭৸//	”	/৭৸//
১নং বরদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী						
		৶৬॥//	৶১। ‡	৶৭৸//	”	৶৭৸//
” সুরেশকিশোর আচার্য্য চৌধুরী						
		৶৬॥//	”	৶৬॥//	”	৶৬॥//
” ৺ললিতকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর পুত্রগণ						
		৶৬॥//	৶২৲১⅓দন্তি¶	৶৭॥//১⅓দন্তি	”	৶৭॥//১⅓দন্তি

---

* শ্রীযুক্ত সারদা বাবুর পুর্ব্বপুরুষ হইতে ললিত বাবুর পুর্ব্বপুরুষ ৶১। কড়া অংশ খরিদ করেন। পাঁচু বাবুকে (রামকিশোর) দত্তক দেওয়া কালীন ঐ ৶১। কড়া যৌতুক দেওয়ায়, দান সুত্রে মালিক দখিলকার আছেন।

† শ্রীযুক্ত সারদা বাবুর পুর্ব্বপুরুষ হইতে ৶১। কড়া খরিদ করিয়াছেন।

‡ শ্রীযুক্ত সারদা বাবুর পুর্ব্বপুরুষ হইতে ৶১। কড়া খরিদ করিয়াছেন।

¶ শ্রীযুক্ত সারদা বাবুর পুর্ব্বপুরুষ হইতে রাম বাবু ৶২/ ক্রান্তি খরিদ করেন। রাম বাবুর অভাবে কেশব বাবু ৲৲১⅓ দন্তি ও ঈশান বাবু ৲১৲১⅓ দন্তি পান। ঈশান বাবুর ৲১৲১⅓ দন্তি রমেশ বাবুর মধ্যে আছে; কেশব বাবুর ৲১৲১⅓ দন্তি ললিত বাবুর পুর্ব্বপুরুষ খরিদ করিয়াছেন।

১নং সারদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

৬৷৵৵ " ৬৷৵৵ ৫৵ ** ৵

২নং যাদবকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর পুত্র

৬৷৵৵ " ৬৷৵৵ " ৬৷৵৵

" সূর্য্য, দেবেন্দ্র ও কুমুদকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

৩৷৵ " ৩৷৵ ১৷৵৵* ১৷৵৵

" মহিমকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

৩৷৵ ১৷৵৵ † ৫ " ৫

" হরেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

৩৷৵ " ৩৷৵ " ৩৷৵

" মাধবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

৩৷৵ " ৩৷৵ " ৩৷৵

" ঈশ্বর ও ব্রহ্ম আচার্য্যের ওয়ারিশ
সুরেশকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

৪৷৵৵১দন্তি " ৪৷৵৵১ ৪৷৵৵১ ‡ ০

" প্রসন্ননাথ বাগছী

২৵৵২দন্তি ¶ " ২৵৵২দন্তি " ২৵৵২দন্তি

** রমেশ বাবু ১২১ই দন্তি + হরদাস বাবু গঃ ১। কড়া + বরদা বাবু ১। কড়া + ললিত বাবু ১২১ই দন্তি + জগৎ বাবু ১। কড়া = ৫৵ ক্রান্তি।

* শ্রীযুক্ত মহিম বাবু ১৷৵৵ ক্রান্তি খরিদ করিয়াছেন।

† শ্রীযুক্ত সূর্য্য বাবু গ হইতে ১৷৵৵ খরিদ করিয়াছেন।

‡ রাম বাবু খরিদ করেন।

¶ রাজকিশোর আচার্য্যের পুত্র পরাণকিশোর আচার্য্য একমাত্র কন্যা রাখিয়া অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ইনি উক্ত কন্যার গর্ভজাত সন্তান বলিয়া তাঁহার সম্পত্তিতে মালিক দখলকার আছেন।

৪। শিবরাম আচার্য্যের বংশধর।

সম্পত্তি ।০ চারি আনা অংশ।

তৌজি নম্বর	নাম	পৈতৃক অংশ	খরিদা অংশ	একুন	বিক্রিত অংশ	বাকী
৮নং	মহারাজা সূর্য্যকান্ত	।০	৫২//২ দন্তি *	।২//২ দন্তি	”	।২//২ দন্তি

* ঈশ্বর ও ব্রহ্ম আচার্য্য হইতে ৫৪।//১ দন্তি রাম বাবু খরিদ করেন। রাম বাবুর অভাবে তৎপুত্র কেশব বাবু ৫২//২ দন্তি ও ঈশান বাবু ৫২//২ দন্তি প্রাপ্ত হন। ঈশান বাবুর ৫২//২ দন্তি রমেশ বাবুর মধ্যে আছে; কেশব বাবুর ৫২//২ দন্তি মহারাজা বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন।

